প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যের পটভূমি ও প্রধান প্রবনতার প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অবস্থানগত অনন্যতা, মহাশ্বেতার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও রচনাকরণের সংক্ষিপ্ত সূত্রায়ন।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে আজ প্রায় সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত। যে স্বাধীনতার জন্য ভারত বাসী যুদ্ধ বিগ্রহ, আন্দোলন, মহামারী, দাঙ্গা, ক্লান্তি, বিষণ্ণতার মধ্যদিয়ে দিন যাপন করে এবং ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে আসে;সেই স্বাধীনতা বিষফোঁড়ার মতো সঙ্গে নিয়ে আসে দেশভাগ জনিত সমস্যা। যার ফল স্বরূপ মানুষ বাস্তুভিটা হারিয়ে সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে হয়ে যায় দ্বি-জাতি তত্ত্বের শিকার। আর সে কারণেই স্বাধীনতা বলতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রামাণ্য ঘটনা বলে স্বীকৃতি পায় দেশ ভাগের ঘটনা। এই স্বাধীনতার অতীত ইতিহাস মোটেও ঝড়ঝামেলা মুক্ত নয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ঘটে যায় আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, জন যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির গন-পার্টিতে রূপান্তর। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ এ ঘটে আজাদ-হিন্দ বন্দী মুক্তি আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ, সেনা ধর্মঘট, ১৯৪৬ এর নির্বাচন, ডাক্তার শ্রমিক ধর্মঘট, ২৯ জুলাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ক্ষমতা হস্তান্তর নীতি প্রভৃতি মূল দাগের ঘটনা গুলো। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে তীব্র উন্মাদনা উদ্দীপনা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তা তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, পারিপার্শ্বিকের অজস্র হতাশা, দমন-পীড়ন নীতি, খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা এবং রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যদিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে এলো এই চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিন। আর তার ফল স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে এলো অস্থির মানসিকতা, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট, পুঁজিবাঁদীদের তথা কৃষক শ্রেণির সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ভাতের লড়াই, সম্পর্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো প্রতিক্রীয়াশীল সমস্যা গুলোকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালে দেখা যায় কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস, পার্টির বে-আইনি যুগ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ তে দেখা যায় রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট, দক্ষিণ

কলকাতার উপ নির্বাচন, কৃষক আন্দোলনের নতুন দিগন্ত তেলেঙ্গানা, আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম, নিষেধাজ্ঞাযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নির্বাচনের পথ গ্রহন।

এই চল্লিশের দশকেই দেখা যায় খাদ্যাভাবে আচ্ছন্ন গ্রাম্য মানুষ গুলি তাদের ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয় ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে ছুটেছে শহরের উদ্দেশ্যে কারণ ছিয়াত্তরের পর তেরশপঞ্চাশে 'উলঙ্গিনী দুর্ভিক্ষ কন্যা আমাদের দেশ' তাই ছুটে চলে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যদি কোন অন্ন-বস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এভাবেই ভরে ওঠে ওই সময়ের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা। অলিগলি ভরে ওঠে খাদ্য, অন্ন, বস্ত্রহীন মানুষ জনের দ্বারা। শহর কলকাতাও অন্যায়ে, অর্থনৈতিক সংকটে অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে'র ভাষায় তৎকালীন বাংলার বর্ণনা দেওয়া যায় এভাবে. .

> "নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতি-মেধ্য রোগে অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলি ছত্রভঙ্গ। তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন। অন্ধকার কলকাতায় উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে।"[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে বর্ণিত হয়,

> "একটা ছবি। .....রণ-দানব পাক দিয়ে নাচছে, গায়ে লেখা ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩..... এইবার সে মাটির দিকে তুড়ি দিয়ে বলছে এসো এসো। মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কালসার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি লোলুপ হাঁ-করা প্রায়-নগ্না এক বিভীষিকাময়ী নারী মূর্তি। তার পায়ের তলা থেকে আরও একটি মুখ উঁকি মারছে। সে মুখেআবারচামড়ার আবরণও নেই। সে মহামারী। আকাশে উড়ছেচিল শকুনি;গোলা

ফাটছে, প্লেন উড়ছে, ধোঁয়ায় সূর্য দেখা যায়না, সমস্ত ঝাপসা। নিচে লেখা নববর্ষ-১৯৪৩।”[২]

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ অর্থাৎ ১৯১৪ এর রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়েই এই মন্বন্তরের বীজ বপন করা হয়। চারিদিকে টালমাটাল পরিস্থিতি, ১৯৩৯এ জার্মানি আক্রমণ করে পোল্যান্ডকে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয় জার্মানির বিরুদ্ধে। আর স্বাভাবিক কারণেই জড়িয়ে পরে ভারত। ১৯৪১ এ হিটলার আক্রমণ করেন সোভিয়েত রাশিয়াকে। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। জাপান আক্রমণ করে মার্কিন নৌ-ঘাটির উপর। ইতালি এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমেরিকা। জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়,

“চারিদিকে প্রকৃতির অন্য চেহারা, কলকাতা, টোকিয়ো, দিল্লী, মস্কোতে অতলান্তিকের কলরব, সরবরাহের ভোর, অনুপম ভোরাইয়ের গান, অগণন মানুষের সময় ও রক্তের জোগান, ভাঙ্গে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমির চাঁদ, রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক, প্রীতি নেই,- পেতে-গেলে হৃদয়ের শান্ত স্বর্গের, প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।”[৩]

বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্দ হয়ে যায়,যার ফল স্বরূপ খাদ্য বস্তুতে পরে যায় ভাটা। দেখা দেয় খাদ্য সমস্যা, এই সমস্যা এতটা প্রখর হয় যে একটু খানি ফেনের জন্যেও মানুষে মানুষে লড়াই করতে হত। চারি দিকে দুর্ভিক্ষ, অন্ন বস্ত্রের হাহাকার। না খেতে পেয়ে মানুষ পরিণত হয় নর কঙ্কালে। কলকাতার পথে ঘাটে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতো এইসব কঙ্কাল। এরই মধ্যে ১৯৪২ এ জাপান অধিকৃত বর্মা মুলুক থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে থাকে কলকাতায়। এভাবেই কলকাতা ভরে যায় শরণার্থীদের ভিড়ে। তার মধ্যে চলছে দেশব্যাপী আগস্ট আন্দোলন। যা ১৯৫৭এর মহাবিদ্রোহের প্রায় সমকক্ষ বিস্ফোরণ। “১৯৪৩ সালের শেষে সরকারী খতিয়ান, গ্রেফতার হয়ে ছিলেন ৯১,৮৩৬ জন

ভারতীয়”,[৪] ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভেঙে যায় মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। ১৯৪৫ এর ২১ থেকে ২৩এ নভেম্বর তিন দিন ধরে কলকাতায় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, গুলি, শহর জুরে জনতার সঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারির লড়াই। ১৯৪৬এর ১১ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে আবার মিছিল, আবার গুলি আবার মৃত্যু। অপর দিকে গোটা দেশজুড়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আজাদ হিন্দ বন্দী মুক্তির সভা ও আন্দোলন এবং ১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট রাত বারটায় প্রাপ্তি হয় খন্ডিত স্বাধীনতা।

বস্তুত পক্ষে অবিভক্ত বাংলার দ্বিধাবিভক্ত রাজনীতির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলার জনমানবের সমাজ জীবন ও সাহিত্যে। চঞ্চল বিক্ষুব্ধ অস্থির ও কলহ পরায়ণ জনজীবনে একদিকে যেমন নিজের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার প্রচেষ্টা অন্যদিকে তেমনি পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা। এই দুইয়ের টানা পোড়েনে বিষ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশক পরিপূর্ণভাবে মত্ত হয়ে ওঠে। যার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় এই সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ছত্রে। এই সময়ের সমাজ চিত্রে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় বিহার উড়িষ্যার বিযুক্তিকরণের ঘটনা (১৯১১), দেখাদেয় প্রগতি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন (১৯৩৫-১৯৩৭), জমিদারি উচ্ছেদের সুপারিশ, ভূমি রাজস্ব কমিশন কর্তৃক (১৯৩৮), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬), মুসলিম-লীগের বর্গাদার সমসাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল। এমনই সংকট ও সম্ভাবনায় ভরা বিষ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশক। বিশেষ করে চল্লিশের দশকের গোড়াতেই এসেপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেশব্যাপী উন্মাদনা ও উত্তেজনা, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১-১৯৪৫)। একটি জাতি একটি দেশ হয়ে গেল দুই টুকরো। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ধনরত্ন সমস্তকিছু বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তানে অবস্থিত হিন্দুরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে-চলে আসে বর্তমান ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানরাও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ফিরতে থাকে পাকিস্তানে। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বাংলার ভূ-খণ্ডে উদ্বাস্তু কিছু মানুষ তাদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে ঢুকে পরে চোরের মতন। এপারের ঝোপে ঝাঁরে খালে বিলে অনাবাদী ভূখণ্ডে আগাছাভরা

পরিত্যক্ত এলাকায় গড়ে উঠল তাদের নতুন বসতি। ভারতবর্ষ এভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের গল্পকারদের নাম ও প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্পের কথা যদি উল্লেখ করা যায় তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গল্পকারদের। পরবর্তী সময়ে পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনা পোতা আবিষ্কার', 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'ধূলিধূসর', 'মহানগর', তারাশঙ্করের 'জলসাঘর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'জগদীশ গুপ্তের 'পাইক শ্রী মিহির প্রামানিক', 'শ্রীমতি', 'উপায়ন', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'মেঘাবৃত্ত অশনি', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দিন মজুর', 'অসীত', 'নারীমেধ' 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'সরীসৃপ', 'ভেজাল', অচিন্ত্য কুমারের 'ইতি', 'আকাশ', 'বসন্ত', 'অধিবাস', 'ডবলডেকার', বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়', রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প', 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে', 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'শ্বেত পত্র', 'অসামান্য', 'সঘরেতে ভ্রমর এলো', 'নতুন লেখা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'প্রকৃতির ইতিহাস', 'মন পবন', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিষ্ট', মনোজ বসুর 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'একদা নিশীথ কালে', প্রবোধ কুমার সান্যালের 'কয়েক ঘণ্টা মাত্র', 'দিবাস্বপ্ন', 'সায়াহ্নে', 'বন্যাসঙ্গিনী', 'অঙ্গার', 'আদি ও অকৃত্রিম', প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপাঠ', 'গালি ও গল্প', 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠপর্ব', 'ডাকিনী', 'গল্পের মতো', এছাড়াও ছিলেন পরশুরাম (রাজশেখর বসু), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়), পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত সেন ও আরও অনেকেই। এদের গল্পে পরিলক্ষিত হয় অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, প্রচেষ্টা, কারো কারো গল্পে ছিল ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ এমন কি যুগের দাবিও বর্ণিত হয়েছে। হতাশা বিশ্বাস রিক্ততা, পরিবেশ সচেতনতা এবং বাস্তব চারিতাই ছিল এই সময়ের গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। তবে রবীন্দ্র ভাবনার পরিবেশ থেকে তা ভিন্ন মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে।

চল্লিশের দশকের ছোটগল্পের মূল প্রেক্ষিত হিসেবে উঠে আসে সমাজ সংঘর্ষের যন্ত্রনা এবং প্রতিবাদ। রাজনৈতিক অবস্থা, অন্যায় অত্যাচার, কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থ সম্পত্তি, ফসল রক্ষার লড়াই, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বৈষম্য নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে ফসল রক্ষার চেষ্টা এবং আন্দোলন। নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলেই আন্দোলনে নেমে পড়ে। কৃষকের কারারুদ্ধ হওয়া, প্রহৃত হওয়া এবং তথাপি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, দেশভাগ, জাতি দাঙ্গা, নতুন নতুন সরকার গঠন, অভাব-অনটন প্রভৃতিই এই সময়ের ছোটগল্পের মূল প্রেক্ষিত হিসেবে উঠে আসে।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই ১৯৫০ এর ২৬এ জানুয়ারিতে ভারতকে এক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা এক বিশাল আকার ধারণ করে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বাধ্য হন ভারতে আসতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। কলকাতার অলিতে গলিতে, বাস-স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, মাঠঘাট ভরে ওঠে এই উদ্বাস্তুদের বাস্তু ভূমিতে। '১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের আইন সভায় এমন সব বৈষম্যমূলক আইন করা হয়, ফলে সংখ্যালঘুরা নিজের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। তাই পূর্বপাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগ অব্যাহত থাকে। '[৫] বস্তুত পক্ষে এই উদ্বাস্তু সমস্যার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের তথা ত্রিপুরা এবং কিয়দংশ আসামের রাজনৈতিক' সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিক জীবন যাপনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৫২এর অক্টোবরে বর্গাদার আইন সংশোধন করে অর্ডিন্যান্স জারি, ১৯৫৩ সালে জমিদারি দখল আইন, ১৯৫৩তে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন নিয়ে ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি এক পয়সা বৃদ্ধি করে ট্রামের ভাড়া। এর বিরুদ্ধে বাম পন্থী দলের আন্দোলন এবং বিদ্রোহ। ১৯৫৪র ১০ই ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষক আন্দোলন। ডিসেম্বরে কলকাতা পুলিশের অনশন, ধর্মঘট। ১৯৫৫র জানুয়ারিতে সত্যাগ্রহীরা কর আন্দোলন করেন। ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়। জমিদারি দখল আইন অনুযায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার অবসান করা হয়। ১৯৫৬তে কলকাতার উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ১৯৫৭তে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট। ১৯৫৮তে আবার শিক্ষক ও শিক্ষিকার অনশন ও ধর্মঘট। ১৯৫৯এ খাদ্যদ্রব্যের অভাব চরমে পৌঁছায়। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দুর্ভোগ বৃদ্ধিপায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় এবং তার বিরুদ্ধে

আন্দোলন দেখা দেয়। এভাবেই আন্দোলন সংগ্রাম, অসন্তোষ এবং মিমাংসা-অমিমাংসার চক্রব্যুহ্যে পরিপূর্ণ পঞ্চাশের দশক।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে আগত বাঙ্গালীর বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা বাংলা সাহিত্যকে খুব একটা অনুপ্রানিত করেনি। তথাপি বলা যায় 'স্বাধীনতা পরবর্তী দশ বৎসরে যা সম্ভব হয়েছে পূর্বে হাজার বছরেও তা সম্ভব হয়নি। ' কেননা স্বাধীনতা পরবর্তী চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় বাংলা কথা সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন। কথা সাহিত্যের ছোটগল্প নামক প্রকরণে ফুটে ওঠে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আলোকিত করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম স্বর গুলিকে। এই বাস্তবতাকে শুধু যে ছোটগল্পেই বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, উপন্যাস, কবিতা, নাটক এবং বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রতিবেদনেও ফুটে উঠত ঐ সময়ের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তবে আমরা একথা অনায়াসে বলতে পারি যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংগ্রাম, বেদনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অভাব-অনটন, বৈষম্য-নিয়ে কোন মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনা হয়নি যতটা হয়েছে ছোটগল্পের ক্ষুদ্র প্রতিবেদনের মধ্যদিয়ে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য শুভেন্দু বারিকের কথা.....

> "সাহিত্যের তাগিদ আসে এই সমাজ ও জীবন থেকেই। বাইরের ঘটনা গুলি ক্ষেত্র রচনা করে মাত্র, অন্তরস্থিত বীজ তখন উপ্ত হবার জন্য উন্মুখ হয়, কালক্রমে তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফুলে ফসলে ভরে ওঠে, সমকাল ও অনাগতকালের ক্ষুধা-মেটাবার আয়োজনকরে। এভাবেই চলে এসেছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া।"[৬]

শুভেন্দু বারিক সত্যি কথাই বলেছেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ জাতিদাঙ্গা, দেশবিভাগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কারনে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে এসে পারায় চাপ সৃষ্টি হয় এপার বাংলায়। দেখা দেয় খাদ্য, বস্ত্র, অন্ন এবং বাস্তু জমি জনিত সমস্যা ও বেকার সমস্যা। স্বাধীন ভারত সরকারও চালিয়ে যায় তাদের দমন পীড়ন নীতি। ক্ষুধার্থ মানুষের মুখে অন্ন

তুলে দিতে না পারলেও তাদের বুকে গুলি তুলে দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। কেন্দ্রীয় ওরাজ্য সরকার যে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারেনি এই সামাজিক দুর্দশার চিত্রের মধ্যদিয়েই প্রমানিত হয়ে যায়। কালো বাজারিতে ভরে ওঠে চারিদিক। খুন খারাবি, ধর্ষণ, নির্যাতন এসবই হয়ে ওঠে নিত্য দিনের ঘটনা। বহু নারী ঠিক এই সময়ই পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যৌন জীবন যাপনের পথও বেচে নেয়। এই সব ঘটনাবলীকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করতে থাকেন শিল্পী সাহিত্যিকেরা। তাইতো তারা নীরব থাকতে পারেনি, থাকা সম্ভবপরও হয়নি। বাস্তবের এই সমস্যা জনিত রূপ গুলিকে শিল্প সাহিত্যে প্রতিবাদ জনিত কারনে ব্যবহার করতে থাকেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ বাংলা ছোটগল্প যে ঐ সময়েরই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের বা সমকালের লেখকেরা যেমন পরেও লেখালেখি করেছেন তেমনি নতুন লেখকের আবির্ভাবও ঘটেছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। এই পরবর্তী সময়ের লেখকদের প্রায় অধিকাংশের লেখায় দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, খাদ্য সমস্যা, বেকারত্ব, রাজনীতি, হিংসা, দমন নীতি প্রভৃতি বিক্ষোভ জনিত বেদনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এত হতাশার মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প নামক প্রকরণটি যেন সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে এল এক নতুন প্রতিশ্রুতির বার্তা। উপন্যাস ও ছোটগল্পে এই প্রতিশ্রুতির বানীই প্রচারিত হতে থাকে। তবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্প নামক প্রকরণটি অধিক ভাব বহনকারী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। সমাজে প্রচলিত পুরানো মূল্যবোধকে ধ্বংস করে বিনির্মানের পথে এগিয়ে চলেছে সমাজ। আর এর মূল কারণ হল মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন যাপনের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, আর সে কারনেই এই সময়ের বাংলা ছোটগল্প মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনালেখ্যে পরিপূর্ণ। কেননা ‘এই সময়ে উপন্যাসকে নিয়ে প্রকাশনীরা এমনকি উপন্যাসিকরাও উপন্যাস রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করে।’ আর সে কারনেই নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণির পাঠকেরা উপন্যাস নামক প্রকরণটিতে সঠিক আস্থা রাখতে পারেনি চিত্ত বিনোদন সর্বস্ব উপন্যাসের উপর। বস্তুত এসব কারণেই ছোটগল্প নামক প্রকরণটি পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে একেবারে আন্তরিক ভাব প্রকাশের আর এক রূপ। তাছাড়াও ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের এমন একটি

শিল্প মাধ্যম যার মধ্যদিয়ে পাঠক নিজেকেই নিরীক্ষণ করেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবের আনন্দে। এই অনুভব পাঠককে যেমন বিস্তৃত করে তেমনি আবার ভাবায়ও। আর এই ভাবনার মধ্যদিয়ে কোনো কোনো গল্প জীবনের বড় উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায়। ছোটগল্পও যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণে শীর্ষস্থান দখল করতে পারে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প যেন সেই ক্ষমতারই প্রমানদেয়। এ কারণেই বোধয় ছোটগল্প পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সমাজে যেভাবে প্রচলিত পূরণ মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ক্রমশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছে সমাজ ঠিক সেভাবেই।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবন যাপনের চালচিত্রই পঞ্চাশের দশকের গল্পকারদের গল্পে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই সময়ের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বানী রায়, সুলেখা সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত নিয়োগী, শচীন দাস, আশীষ বর্মন, গৌতম ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র দত্ত, অশোক রঞ্জন সেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সমরেশ মজুমদার, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, স্বদেশ রঞ্জন দত্ত, জয় গোস্বামী, শিবশম্ভু পাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, দেবেশ রায়, অসীম রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বানী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ঝরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, গৌতম ভট্টাচার্য, চিত্তসিংহ, শৈবাল মিত্র, হর্ষ দত্ত প্রভৃতি আরও অনেকেই রয়েছেন। তবে উপরে উল্লেখিত গল্পকারদের মধ্যে সকলেই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গল্পকার নন। অনেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত গল্প রচনা করেছেন। আবার অনেকে স্বাধীনতা সমসাময়িক সময়কালে আবির্ভূত হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় এর দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গল্প রচনার কাজে অব্যাহত রয়েছেন।

স্বাধীনতা সমসাময়িক সময়ে যে সমস্ত গল্পকার বাংৱলায় গল্প রচনার কাজ শুরু করেন তাদের গল্পে আমরা সেই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, হাহাকার, অন্ন বস্ত্রের

অভাব, দাঙ্গা, আন্দোলনের জয় ও পরাজয়কেই পরিলক্ষিত করি। এই উত্তাল উন্মত্ততা অধিকার স্থাপনের আন্দোলনই পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের দশকের ছোটগল্পের মূল বিষয়। এই সময়ের একজন প্রভাবশালী গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'বন্দুক' এই সময়ের একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে দেখা যায় ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯ এর রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ চিত্র। এই সময় কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থ সম্পত্তি ও ফসল রক্ষার লড়াই চলছিল। সেই লড়াই যে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল তারই চিত্র বর্ণিত হয়ে উঠেছে গল্পের মূল বিষয়ে। সেখানে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতার কোন ভেদাভেদ নেই, সকলই মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যৌথভাবে ফসল রক্ষার প্রক্রিয়া চালিয়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু সকলই যৌথভাবে আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। পুরুষরা সারাদিন ফসল উঠানোর কাজে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ত নারীরা যে যা পেরেছে (দাঁ, কাটারী, বটি, লাঠি) নিয়ে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারারাত ব্যাপী ফসল পাহারা দিয়েছে। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছে বর্গাদার, জোতদারদের আগমন বার্তার জন্য। অনেকে কারারুদ্ধ হয়েছে প্রহৃত হয়েছে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এরকমই দুঃখ দারিদ্রতার প্রতিচ্ছবি এবং সে সঙ্গে গর্জে ওঠা প্রতিবাদই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বন্দুক' গল্পটির মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন পাঠক শ্রেণির কাছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এরকমই আর একটি গল্প হল 'দুঃশাসন'। লেখক গ্রামের আড়তদার, পুলিশ অফিসার ও গ্রামের সাধারণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেকারণেই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার সার্থক চিত্রায়নে সার্থকতা লাভ করেছে 'দুঃশাসন' গল্পটি। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের কাহিনি তিনি একালেও লক্ষ করেছেন। পরপর ঘটে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই, ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ, ভারত ও চীনের সীমান্ত যুদ্ধ প্রভৃতির কারণে ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষের দুর্দশা যে কতটা ভয়ঙ্কর পরিণতি ধারণ করেছে তারই প্রতিরূপ 'দুঃশাসন' গল্প। গঞ্জের আড়তদার, জমিদার এবং ব্যবসায়ীর দল নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য যে কতটা নির্লজ্জ এবং স্বার্থপর হতে পারে তার প্রতি রূপই প্রকাশিত গল্পের দেবীদাস নামক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। গল্পে দেবীদাস গঞ্জের আড়তদার, তাঁর কাছে গ্রামের একজন হত দরিদ্র কৃষক নিজের যুবতি কন্যা ও স্ত্রীর জন্য দুটি কাপড়ের আবেদন নিয়ে এসেছে। কিন্তু দেবীদাস তাকে মুখের উপর বস্ত্র নেই বলে না করে দেয়। অথচ তাঁর গুদাম ঘর কাপড়ে পরিপূর্ণ রয়েছে। গরীব কৃষককে কাপড় না দেওয়ার কারণ চোরাই পথে

কাপড় পাচার করে অধিক অর্থ উপার্জন করা। অপর দিকে বস্ত্রের অভাবে গ্রামের মা-বোনেরা ঘরের বাইরে আসতে পারেনা রাতের অন্ধকার ছাড়া। দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল ভর সভায় দু:শাসনের হাতে। আর এখানে এ সময়ের নারীরা বস্ত্রহীন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয় দেবী দাসের মতো দু:শাসকের শোষণে। গোটা সমাজ ব্যবস্থাই হয়ে উঠেছে দু:শাসনের প্রতিরূপ। তাইতো নারীরা রাতের অন্ধকারে নিরাবরণ অবস্থায় পুকুরের জল ঘরে নিয়ে আসে। অথচ দেবীদাসের মতো উচ্চ শ্রেণির ব্যবসায়ীরা এমন দুর্দশার সময়ও কাপড় গুদামে রাখার বিনিময়ে পুলিশকে টাকা ঘুষ দেয়। রাষ্ট্রের প্রশাসক যখন মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে নীরবে অন্যায়কে সহ্য করে তখন সাধারণ মানুষের কিছু করার আর কীবা থাকে। তাই সধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের উপর অন্যায় ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বারতেই থাকে। পঞ্চাশের দশকে এমন রাজনীতিপ্রবন সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীর অভাব মোটেও ছিল না। আর সে কারণেই গল্পকার গল্পের অন্তিম মুহূর্তে নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়কে, যা চিরকালের বিশ্বাস। অর্থাৎ সাধরণ গরীব মানুষের দু:খ দূর করার এক বার্তা এই গল্পের মধ্যদিয়ে পৌঁছে দেন গল্পকার। এভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজ বাস্তবতার দিকগুলি ফুটে উঠেছে তাঁর 'ইতিহাস', 'রেকর্ড', 'ভাঙা চশমা', 'সৈনিক', 'পুস্করা', 'টোপ', 'হাড়', 'বীতংস', ও 'বনতুলসী'র, মতো ছোটগল্পে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গল্পকারদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে আরো এক জন গল্পকারের নাম, তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। মানব জীবনের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের প্রয়াস, ব্যর্থতা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। সব ধরনের মানুষের নিরাসক্ত ভাব বিলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তি জীবনের বহির্বাস্তবের ঘটনা ছাড়িয়ে মানব মনের অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিচরণ। মানব মনের আদিম প্রবৃত্তি লীলা চিত্রনে সুদক্ষ শিল্পী হিসেবেই পরিচিত।

উত্তাল চল্লিশের কলকাতায় বসবাসকারী মধ্যবিত্ত মানুষের কথা বলেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর ছোটগল্পে। দেখিয়েছেন নাগরিক জীবনের শ্রেণিবৈষম্যকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সমাজে যে ভাঙন রীতির অসহায় সমাজ জীবন তার পূর্ণ রূপ

তিনি তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেন। গল্পের প্রয়োজনে যৌনতাকে আনলেও তাকে মধ্যবিত্ত ভদ্র জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য পূর্ণ করে তোলায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। গল্পে বর্ণিত নর-নারীকে তিনি প্রত্যক্ষ বস্তু জগৎ থেকেই সংগ্রহ করেন। তবে তাঁর গল্পে অন্তর্জতের বিশ্লেষণ অন্যতম ভূমিকা নেয়। মনের গহনে জটিলতার যে সব স্তরে সহজে আলো পড়ে না, তাঁর গল্পবীক্ষা সেদিকের চূলচেড়া বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়।তাঁর চরিত্রেরা মানুষ কোথায় স্বকীয়তা, স্বতন্ত্রতা এবং নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট তাই তিনি দেখতে ও দেখাতে চান। 'তাই তিনি বাস্তববাদী লেখক নন তাঁর চেয়েও কিছু বেশি।' তাঁর শিল্প চেতনায় নারীর শরীর ভোগের উপাদান নয়, সৌন্দর্যের আধার চেতনা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এরকমই একটি গল্প 'চোর', তিনটি শিশুর মধ্যদিয়ে শ্রেণি বৈষম্যের দিকটিকে তুলে ধরেছেন। উচ্চ-মধ্য-নিম্ন এই তিনটি শ্রেণির জীবন যাপন সমাজে যে কতটা ক্রিয়াশীল তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন গল্পকার প্রকৃতির কিছু প্রতীকের মধ্যদিয়ে। গল্পে সে রকম কোন কাহিনি নেই, নিম্নবিত্ত কিশোরের জবানিতে এই গল্প এগিয়ে গেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ সমাজ জীবনকে কীভাবে যে যাপন করে তার পরিপূর্ণ এক জীবন প্রণালী গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র মিন্টু নামক শিশুর মধ্যদিয়ে তুলে ধরেন।

'গিরগিটি' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে বিশিষ্ট সৌন্দর্য চেতনার প্রকৃত পরিচয় এবং সে সঙ্গে গহীন মনের জটিলতার ছবি। ভেজা স্যেঁতস্যেঁতে শরীরে কুয়োর পারে বসে এক যুবতী বধূর মলিন স্নান করতে দেখত এক বয়স্ক বৃদ্ধ। যা দর্শন করে ঐ বৃদ্ধ আনন্দ অনুভব করত। ঐ বৃদ্ধের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাই একটি পরিপূর্ণ প্রকৃতির পার্শ্ববর্তী এক অপরূপ চিত্রের অন্য আরো এক রোমাঞ্চকর প্রকৃতি দর্শন। নিরাভরণ যুবতীর রূপ, একাকিত্ব, নির্জনতা, গিরগিটি, শ্যাওলা, কচুরিপানা প্রভৃতি কুয়োর চারি পাশকে যেন পূর্ণতা দান করেছে। বুড়ো মুগ্ধ হয়েছে যুবতীর মসৃণ চামড়ার উপর শুভ্র সাবানের ফেনা লেগে থাকার সৌন্দর্য দেখে। এই সৌন্দর্য বাসনাই এখানে মূল বিষয়। 'যৌন বাসনা এখানে সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন।' নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচু গাছ, জলের ধারা, প্রজাপতি, গিরগিটি, প্রকৃতির খন্ড খন্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জগতকে নিয়ে যেন প্রকৃতিরই পরিপূর্ণতা দান করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে জাপানী আক্রমন, কলকাতার জন জীবনে দেশবিভাগ জনিত অর্থনৈতিক মন্দা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা এবং কর্ম সংস্থানের সমস্যাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের মূল পটভূমি। বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-ব্যর্থতা, রোমান্টিকতাকে নিয়েই তাঁর গল্প রচনা করেন। আধুনিক কালের গল্প রচয়িতাদের মধ্যে বাস্তববাদী রোমান্স প্রিয় লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। পল্লী জীবনের ও শহর জীবনের ঘরোয়া সমস্যা গুলিকে বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্প গুলিতে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এরকমই একটি গল্প 'পালঙ্ক'।

'পালঙ্ক' গল্পে রয়েছে তৎকালীন বাংলা দেশের ছবি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের দেশভাগ জনিত সমস্যাই এই গল্পের মূল পটভূমি। দেশ বিভক্ত হয়ে যাবার পর পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বাংলা দেশে থেকে যান পিতা রাজমোহন। পুত্র সুরেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং মা অসীমাকে নিয়ে চলে আসে কলকাতায়। পিতা রাজমোহন কোন মতেই তাঁর বাংলা দেশের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, অর্থ-সম্পত্তি রেখে কলকাতায় আসতে রাজি নয়। বাংলা দেশের একটি ছোট্ট গ্রামে ক্ষেতভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, ঘর ভর্তি বস্তু সামগ্রী কোন কিছুরই অভাব নেই। মর্মন্তুদ ঘটনা এই যে বাংলা দেশে আজীবন দুধে ভাতে থাকার নিরাপত্তা থেকে দেশভাগ জনিত সমস্যা তাদের এনে ফেলেছে কলকাতার নাগরিক জীবনের এক প্রান্তে। রাজমোহনের ঔরসজাত সন্তান সুরেন আজ ভিন্ন দেশের ভিন্ন কালের মানুষে পরিণত। দেশভাগের সীমারেখা আজ দুটি মানুষের মধ্যে হয়ে উঠেছে দুই প্রজন্মের সীমানা। অভাব অনটনে জর্জরিত হয়েছেন রাজমোহন। তথাপি তাঁর একমাত্র শেষ অবলম্বন তাঁর পুত্র বধূর সাধের পালঙ্ককে বিক্রি করতে দ্বিধান্বিত। এই পালঙ্কের সংরক্ষণ, বিক্রয়, স্মৃতি এবং সমস্যা জনিত কারণেই 'পালঙ্ক' গল্পের সূচনা এবং শেষ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'পালঙ্ক' গল্পের মধ্যদিয়ে সমাজ দর্শনের এক বিচিত্র রূপের দর্শন করান গল্পের পাঠক বর্গকে। পাশাপাশি সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে তাদেরজীবন যাপনে কতটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তার রূপচিত্রও ফুটে ওঠে।

গল্পকার বিমল করের সাহিত্য জীবনের শুরু বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শুরুতেই। তিনি তাঁর সাহিত্যে মানুষের মনকে বাস্তব দৃষ্টিতে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। এই বিমল

করের গল্পের মধ্যদিয়ে বাংলা ছোটগল্পের পালা বদল শুরু হয়েছে। লেখকের তীব্রতম আত্মিক প্রকাশ আমরা বিমল করের মধ্যেই লক্ষ করি। জীবন জিজ্ঞাসাকেই তিনি বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের অন্তরে যে জটিলতা, অন্তর ও বাহিরের যে সূত্র সম্বন্ধ, নিঃসঙ্গ অন্তর জীবনে যে বেদনা ও অসহায়তাবোধ এই সব বক্তব্য বিমল করের গল্পকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাকে কোন ভাবেই আমরা পূর্ব ধারার অনুস্মৃতি বলে মনে করতে পারিনা। আত্ম আবিষ্কারের শুদ্ধ প্রয়াস তাঁর গল্পে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হল, 'আত্মজা', 'মানব পুত্র', 'পার্করোডের সেই বাড়ি', 'উদ্ভিদ', 'পলাশ', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'যযাতি', 'শূন্যে', 'নিষাদ', 'অশ্বথ', 'পিতৃঘ্ন', 'সুধাময়', 'জননী', 'অপেক্ষা', প্রভৃতি।

বিমল করের পরবর্তী গল্পকার হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন রমাপদ চৌধুরী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের জগতে। এই মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক রূপকে মানুষের চোখের জলের মধ্যদিয়ে সমগ্র যুদ্ধের ছবিকে দেখাতে চেয়েছেন। দাঙ্গা, মন্বন্তর, বিক্ষোভ, উদ্বাস্তু সমস্যা এই সব কিছুকেই সর্বভারতীয় রূপদিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। বিমল করের এরকমই একটি গল্প 'ভারতবর্ষ'। এই গল্পে দেখিয়েছেন ব্যক্তি ও সমাজের গভীর মর্মবোধ। যুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক জীবনধারা কীভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হারিয়ে সতর্কতা সন্ধানের প্রচেষ্টাই এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্যে ফুঁটে ওঠে গল্পকারের ইতিহাস বোধ, জাতীয়তা বোধ এবং মর্মন্তুদ আত্ম যন্ত্রণা ও বেদনা। মাহাত গ্রামের মধ্যদিয়ে গোটা ভারতবর্ষের সংকটের কথা জানিয়েছেন গল্পকার। রেল ষ্টেশনে বিদেশী সৈনিকের পয়সা দান, মাহাত গ্রামের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই এই পয়সা কুড়ানোয় ভির করে। ভিক্ষাবৃত্তিতে আত্মনিয়োগকে ঠিকাদার ও মাহাত বৃদ্ধের মধ্যদিয়ে সংযতকরে। এই আত্মসম্মান বোধ ও সচেতনতাতেই গল্পের সমাপ্তি।

বস্তুত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে একজন মানুষের আত্মসম্মান বোধ হারানোর গল্প। তবে বঞ্চনা, হতাশা, গণবিক্ষোভ, বেকারত্বই এর মূল বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মনে উনিশ শতক থেকেই যে দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে ছিল তারই যন্ত্রনাময় প্রকাশ

এ গল্প। অস্তিত্ব যে বিপন্ন তারই দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এ গল্প। এ গল্পের ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্ন আছে লেখকের দেশ প্রেম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের যে সামাজিক সংকট ও পরিণতি গল্পকার তা সার্বিক বেদনা রূপে প্রকাশ করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গল্প হল 'দরবারী', 'রেবেকা', 'সোরেনের কবর', 'নারীরত্ন', 'উত্তরাধিকার', 'আমি আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি।

চল্লিশের দশকের যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীর জীবন মরণ সমস্যা গুলিকে বাস্তবতার রূপদিয়ে সাধারণ পাঠক শ্রেণির কাছে তুলে ধরেন রতন ভট্টাচার্য তাঁর 'পিঞ্জর' গল্পের মধ্যে। এই গল্পে আমরা বাংলাদেশ থেকে আগত ভারতবর্ষের উদ্বাস্তু সমস্যাকেই প্রত্যক্ষ করি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ বিভাগের পর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে ওপার বাংলায় বসবাস কারী একটি মেয়ের এপার বাংলায় চলে আসা। জন্মভূমি, পরিবার, পরিজনের টানে জীবন মৃত্যুকেও ভয় না করে ভালবাসার মানুষকে ত্যাগ করে ওপার বাংলায় ফিরে যাওয়ার কাহিনি নিয়েই গল্পের রচনা। গল্পকার বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করেই তাঁর গল্পের কাহিনি রচনা করেছেন। কেননা বাস্তুহারা উদ্বাস্তু দের স্বজন হারানোর অশ্রু বেদনা একসময় চরমে উঠেছিল।

মতি নন্দী যুদ্ধোত্তর সময়ে শহর কলকাতায় অবস্থিত নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচনা করেন 'ছাঁদ' গল্পটি। অর্থনৈতিক দৈন্যতায় জীবন যাপন প্রনালী যে কত ভয়ঙ্কর তা দেখিয়ে দিয়েছেন 'চোরা ঢেউ' ও 'বেহুলার ভেলা' গল্পে। 'শেষ বিকেলের দুটিমুখ' গল্পে মতি নন্দী যেন প্রমান করেন যে আত্ম মর্যাদা, মান সন্মান প্রভৃতির থেকেও বড় বাস্তব ও কঠোর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পেটের ক্ষুধা। বিনা টিকিটে ট্রেনে যাত্রা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ তথাপি পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুটি মেয়ের সেই ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। কারণ বিনা টিকিটের ট্রেনের যাত্রী ভেবে পুলিশ তাদের অ্যারেষ্ট করবে এবং হাজতে নিয়ে যাবে। সেখানে গেলে পরে তারা দুদিন দুমুঠো খেতে পারবে এই ছিল তাদের দু-বোনের প্রত্যাশা। অনাহারক্লিষ্ট জীবন যাপন যে কত

কষ্টকর তা এই দুই বোনের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন গল্পকার মতি নন্দী। বস্তুত, গল্পকার এখানে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার চরম বাস্তব সত্যটিকে তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও পঞ্চাশের দশকে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য গল্পকার রয়েছেন। যেমন, দেবেশ রায়, দ্বীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গল্পকারদের গল্পের মূল পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে স্বাধীনতা সমসাময়িক এবং পরবর্তী পঞ্চাশের দশকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটেই রচিত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাংলা ছোটগল্প।

বাংলা ছোটগল্পের এক নতুন আন্দোলন পরিলক্ষিত হয় পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের শুরুতে। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পের মূল বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজ বাস্তবতা তথা রাজনীতির বিভিন্ন রূপের বর্ণনা। এই সময়ে ব্যর্থতা, হতাশা, ক্লান্তি, জয় পরাজয়ই ছোটগল্পের বাহন। ষাটের দশকের শুরুতেই এই ধারার পরিবর্তনের সূচনা শুরু হয়ে যায়। কেননা এই সময় থেকেই সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ব্যবসায়ীদের অর্থ তহবিলেও বিত্তের পরিমান বারতে থাকে।শিল্পায়নেরও শুরু হয় এখন । ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। 'সাহিত্য যে সমাজেরই দর্পন' তাই সমাজের এই উন্নয়নের ছাপ পড়তে থাকে ছোটগল্পের কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে সত্য কথাই তুলে ধরেছেন সুমিতা চক্রবর্তী।

> "ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ও সার্বিক আবহের সংঘাতের ফলেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয়। সেই আঘাতেই যুগে যুগে ঘুরে যায় তার গতিপথ। চল্লিশের দশকেরছোটগল্পকে যদি বলি সমাজসংঘর্ষেরযন্ত্রণার আর প্রতিবাদের গল্প। তাহলে পঞ্চাশের এই নব্য ধারারগল্পকেও বলব সামাজিক সংঘাতেরই পরিনাম, তবে এখানে গনউদ্দীপনায় প্রতিবাদী

> অভিব্যক্তির পরিবর্তে অন্তর্মুখী ও আত্মদহনক্লিষ্টরক্ত রেখাঙ্কিত মনোচিত্রন ফুটে ওঠে। এখানেও মানবচিত্তে বিপুল ব্যথার সমাহারী নিঃশব্দ বিস্ফোরণ থেকেই গল্পের ধারাপথ বদলায়।"[৭]

সত্যি কথাই বলেছেন সুমিতা চক্রবর্তী, কেননা সাহিত্যকে কোন সীমানার মধ্যে বন্দী করে রাখা যায় না। তাই আজকে আমরা ষাটের দশকের ছোটগল্পে যে পরিবর্তন লক্ষ করছি তার বীজ বপনের কাজ পঞ্চাশের দশকেই শুরু হয়ে গেছে তবে খানিকটা ক্ষীণ ও ধীর গতি সম্পন্ন হলেও ষাটের দশকে এসে ফুলে ফলে ভরে উঠেছে বাংলার ছোটগল্পের গতিপথ।

পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পের মূল পটভূমিতে আমরা যুগের দাবিই লক্ষ্য করি। তবে এই যুগ চেতনার বহিঃপ্রকাশের মধ্যদিয়ে এক নতুন ও স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য রচনার মাধ্যম পরিলক্ষিত হয়। 'পঞ্চাশের দশকের তরুণ লেখকদের অভিজ্ঞতা যেমন সময়ের ফসল, তেমনি যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, নৈরাশ্য, আলস্য, বিচ্ছিন্নতা ভাবনার আশ্রয় এই দশকে লেখা একাধিক ছোটগল্প।'[৮] শুধু ছোট গল্প নয়, উপন্যাসেও সামাজিক রাজনীতি ও নৈরাশ্যতা, বিষণ্ণতা, বঞ্চিত ব্যথা বেদনাই নব নব রূপ ধারণ করে প্রকাশিত হতে থাকে। এছারাও ছোটগল্পের বাজারে পঞ্চাশের দশকের বিশেষ সৃষ্টি হিসেবে উঠে আসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঘ', 'পটভূমি', রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর', মতিনন্দীর 'ছাদ', 'চোরা ঢেউ', 'বেহুলার ভেলা', দেবেশ রায়ের 'দুপুর', দ্বীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'জটায়ু', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তুষার হরিণী', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'দশবছর পরে একদিন', দিব্যেন্দু পালিতের 'দুঃসময়', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তোপ', স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলপোকা', যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের 'প্লাটফর্মের গল্পে', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল', প্রভৃতি গল্পকার দের এই গল্পগুলি ছাড়াও আরও অনেক গল্প রয়েছে যেগুলির মধ্যদিয়ে গল্পকারেরা তাদের আত্মিক দ্বন্দ্ব এবং শিল্প কৃতিত্বকে এক নতুন স্বতন্ত্র ধারায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। 'এরা প্রত্যেকেই অনেক বদল ঘটিয়ে নিজ নিজ গল্পের বিষয় ও রীতিকে প্রসারিত করেছেন।'[৯] এভাবেই বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ

যেন চলমান নদীর মতো ক্রমশ বদলাতে থাকে। আর এর মূল কারণই হল মানুষের মনের ভিতর লুকিয়ে থাকা শত সহস্র জ্বালা-যন্ত্রনা, বিরহ-ব্যথা এবং বিস্ফোরণ। এই সময়ের গল্প প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন,

> "চল্লিশের দশকের ছোটগল্পকে যদি বলি সমাজ সংঘর্ষের যন্ত্রনার আর প্রতিবাদের গল্প, তাহলে পঞ্চাশের এই নব্য ধারার গল্পকেও বলব সামাজিক সংঘাতেরই পরিণাম। তবে এখানে গন উদ্দীপনায় প্রতিবাদী অভিব্যক্তির পরিবর্তে অন্তর্মুখী ও আত্মদহনক্লিষ্ট রক্ত রেখাঙ্কিত মনোচিত্রন ফুটে ওঠে।"[১০]

ষাটের দশকে এসে বাংলা ছোটগল্পের আরো এক নতুন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। বিমল করের নেতৃত্বে ষোলোজন গল্পকারকে নিয়ে 'এই দশকের গল্প' নাম দিয়ে একটি পত্রিকা সংস্থা তৈরি হয়। ষোলোজন চিহ্নিত গল্পকারের মধ্যে রয়েছেন অজয় দাসগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতিনন্দী, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, এই গল্পকারদের গল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ভিন্ন আঙ্গিক রীতি, ভিন্ন বক্তব্য এবং বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদ দান করা। এই সময়ের গল্প প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন.

> "ধারা বদলের কিংবা নতুন একটা রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকরা কিংবা বিমল কর কেউই চাননি বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চনা করতে। বিদ্রোহ তাদের কারোরই অভিপ্রেত ছিলনা বোধয়। তবু

তারা পুরনো রীতি,প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন। বহির্মুখিনতার চেয়ে তাদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাদের লেখায় স্ব-কৃত আত্মা প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনামগ্ন ভাব প্রভাবে তির্যক কিংবা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ এবংবাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরে অতি জটিল সূত্রে অন্তরএবং বাহির গ্রথিত হয় স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে।”[১১]

বিমল করের মতে,

“বর্তমান দশকের প্রান্তে এসে দেখা গেল বাংলা ছোটগল্প নতুন করে আবার সজ্জা রচনা করছে। ৩৯এর যুদ্ধ ৪৫এ পেশাদারী ভাবে থেমেছে, দাঙ্গা দেশভাগের পর শাসন তন্ত্র নিজেদের হাতে এসেছে আর তার পরও হাওড়া পুলের গা দিয়ে এক যুগ কতনা জাহ্নবী জলবয়ে গেল। এখন সে যুগের উত্তেজনা শান্ত, ক্লেশ বিস্মৃত, বেদনা অপসৃত। একদা আগুন লাগার কালে আমরা যতটা হতচেতন হয়ে ছিলাম এখন সে প্রলয় সময় কেটে গেলে অনেকটা সুস্থির হয়েছি, সেই ধ্বংস স্তূপের দিকে তাকিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অতঃপর আশ্রয় কোথায়, এই ধ্বংস স্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে কাজে লাগানোর মতন কিবা নেওয়া যায়। এই দশকের লেখকেরা সম্ভবত এই কথাটি ভেবেছেন। ..... যে জ্বালায় আমরা পুড়েছিলুম এঁরা সেই জ্বালার তাৎক্ষনিক ক্লেশ থেকে মুক্ত, সুতরাং পোড়া চেহারার রূপটি অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক

> চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের প্রাথমিক আপৎ থেকে মুক্ত বলে এঁরা আরও ব্যাপক জগতকে দেখায় ব্রতী।”[১২]

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত কল্লোল এর লেখক শ্রেণির জন্য মতামত দেন এভাবে,

> “সেই সাড়াটা কল্লোলের লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ, নতুন দ্রোহবানী সত্যভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচল প্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে,..... রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাতও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লা কুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়। ..... কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল, উদ্দামতা, সমস্ত বাঁধা বন্ধনের নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।”[১৩]

পঞ্চাশের শেষে এবং ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পের এক নতুন ধারা বাংলা সাহিত্যকে প্রগতিশীল উন্নয়নের জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও বৃহৎ পাঠক বর্গের নিকট এই সময়ের গল্পকারের গল্পগুলিকে পৌঁছেদিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়নি। তথাপি যতটুকু পরিসরের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে এই সময়ের গল্পকারের গল্প ততটুকু পরিসরেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নতুন রীতি, ভাষার আঙ্গিক, ঐতিহ্যের বিরোধিতা, বাইরের জগতের বিবরণ, অন্তর জগতের মনন, সর্বোপরি এক নতুন, বাস্তবতার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দানে সম্পূর্ণ সার্থক এই সময়ের গল্পকারেরা। মধ্যবিত্ত

শ্রেণির রুচি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, প্রজন্ম, দ্বন্দ্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, প্রেম এবং সমাজের বিভিন্ন প্রগতি শীল চিন্তন স্থান পায় এই সময়ের গল্পে। আর গল্প পাঠকেরা ছোট ছোট অনুভবের উল্লাসে খুঁজে পান নিজেকে।

> "ছোটগল্পের ভাষায় আমূল পরিবর্তন আনছে ষাট দশকেরছোটগল্প লেখকেরা। এই লেখকগন পৃথক পৃথক ভাবে এবং যুক্তভাবে ছোটগল্প সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারণারদ্বারা নতুন নতুন ভাষার উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন বা ঘটাবারপ্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। গল্পের কাঠাম ভেঙ্গে দিচ্ছেন ব্যাক্তকরনের ক্ষমতার দ্বারা। ব্যাক্ত করনের ভাষাও আসছে অনুরূপভাবে। ছোটগল্প থেকে কাহিনি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কাহিনির নিজস্ব ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরনো ছোটগল্প যেখানে কাহিনির ভাষায়, গল্পের ভাষায় অন্তরীন ছিল, কাহিনি বিলুপ্ত হওয়ার জন্য ছোটগল্পে গল্পের ভাষা মুক্তি পাচ্ছে। আন্তর জীবনের অভিব্যক্তিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্পের ভাষা।"[১৪]

অন্তর উন্মোচনের সুদক্ষ কারিগর বিমল কর নতুন রীতির গল্প রচনায় যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন তেমনই সুদক্ষতার সঙ্গে পরিচালনাও করেছেন ষাটের দশকের গল্পকারদের। তাঁর লেখা গল্প 'পিতৃঘ্ন', 'বালিকা বধূ', 'আত্মজা', 'উদ্বেগ', 'নিষাদ', 'নারীরত্ন', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি গল্প রচনা করেছেন। কোথাও শিশুর মধ্যদিয়ে, কোথাও যন্ত্র সভ্যতার, কোথাও রাজনীতি, কোথাও প্রকৃতি আবার কোথাও নারী পুরুষের অন্তর জগত ও প্রেম, নারীর অধিকার প্রভৃতি জটিল রেখা পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর গল্প বিশ্বকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ সচেতন গল্পকার সমরেশ বসু প্রায় দুশোরও বেশি ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল, 'এফেক্ট', 'আলোর বৃত্তে', 'আটাত্তর দিন পরে', প্রভৃতি গল্পগুলিতে ফুটে ওঠে জীবন অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ,

প্রেম, দাসত্ব প্রভৃতি মানব জীবনের রহস্যময় দিক গুলিকে পরম দরদে উল্লেখ করেছেন। আবেগ সমৃদ্ধ মমত্ববোধ সম্পন্ন শুভ বিশ্বাসী গল্পকার মানুষের সম্পর্কের জটিলতা, মমত্ববোধ প্রভৃতিকে সরল থেকে জটিলতার দিকে নিয়ে গেছেন এই সময়ের গল্পে,তুলে ধরেছেন সাধারণ দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা পেশাদারী সম্পর্ককে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নীলুর দুঃখ' গল্পে রাজনীতির এক অসামান্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের 'নিরস্ত্রী করণ' গল্পে ফুটে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন। অসীম রায়ের 'অনি' গল্পে রাষ্ট্র যন্ত্রের নৈর্ব্যাক্তিকতার রূপ উঠে আসে। একদা রবীন্দ্রনাথ পতিতাবৃত্তিকে নিয়ে রচনা করেন 'বিচারক'। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনা করেন 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। নবেন্দু ঘোষ রচনা করেন 'রাত্রি'। বিমল কর রচনা করেন 'আঙুর লতা'। সন্তোষ কুমার ঘোষ রচনা করেন 'শনি'। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেন 'বিদ্যুৎলতা'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেন 'বিশ্বাস ঘাতক'। সুব্রত সেন গুপ্তের 'অবিশ্বাস' প্রভৃতি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গল্পগুলিতে পতিতাকে নিয়ে লেখকের ভাবনার নতুন দিক গুলি উঠে এসেছে।

বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশেষত ষাটের দশকে কামানের শব্দ প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই নিস্তব্ধ। বারুদের গন্ধ মানুষ প্রায় ভুলে গেছে। তাই স্বাধীন চিন্তা চেতনার দ্বারা নিজস্ব মনন ও চিন্তনের বহি:প্রকাশ ঘটানোর এক সুন্দর ও সুস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যেখানে আর পরাধীনতার ছাপ নেই। ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ কোন চাপ নেই। সে কারনেই দেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে নিজস্ব ব্যক্তি চেতনার মাধ্যমে গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন গল্পকারেরা। যেখানেই অন্যায় এবং অপরাধ দেখেছেন সেখানেই এগিয়ে গিয়ে কলম তুলে নিয়েছেন এই সময়ের শিল্প সাহিত্যিকেরা। আর সে কারনেই সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিস্তর জায়গা জুড়ে অবস্থান করে আছে ষাটের দশকের শেষের দিকের নকশাল বাড়ি আন্দোলন।১৯৬৭তে এই আন্দোলনের উদ্ভব এবং সমাপ্তি ১৯৭২এ। এই আন্দোলন বহু কবিতা এবং কথাসাহিত্যের ছোটগল্প নামক প্রকরণকে প্রভাবিত করেছে। গল্পের মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, আদিবাসী উপজাতি, ক্ষেত মজুর, ভিক্ষুক, খেটে খাওয়া দিনমজুর এবং প্রায় নিরুপার্জন মানুষ গুলির জীবন কাহিনির সমস্যা এবং সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ

বার্তাই এই সময়ের ছোটগল্প। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমাজের সংকট, খাদ্য সমস্যা, আশ্রয় এবং অস্তিত্ব রক্ষা এই বিষয় গুলিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় নকশাল বাড়ি আন্দোলন। এই বিষয় গুলির প্রতিরূপই সাহিত্যে বর্ণিত হতে থাকে। এই ধারার গল্প রচনার ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। মহাশ্বেতার লেখা গল্প গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল, 'জল', 'অপারেশন বসাই টুডু', 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'আজীর', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'এম ডব্লু বনাম লখিন্দ', 'বেহুলা', প্রভৃতি এই গল্পগুলি এই সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় রচিত ছোটগল্প। গরীব মানুষকে শোষণের নানা দিক, তাদের জীবিকা এবং ক্ষুধাকে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে বর্ণিত করেন মহাশ্বেতা দেবী এই গল্প গুলিতে। সঙ্গে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয় উচ্চশ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

সত্তর ও আশির দশকের গল্পকারেরা এই সময়ের গল্প প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যার মূল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যধিক। দিব্যেন্দু পালিতের মতে,

> "নতুন লেখকদের গল্পে আঙ্গিকগত ও বিষয়গত পার্থক্য ঘটেছে। এখনকার গ্রাম জীবনের গল্পে ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকে গল্প রীতির উপর জোড় পড়েছিল। ষাট ও সত্তর দশকের গল্পে দেখা দিল নানা পরিবর্তন, বিশেষ করে ভাষাগত পরিবর্তন। আশির দশকের গল্পে ভাষা সম্পর্কে সচেতন কম।"[১৫]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> "আজকে শহরের গল্প ও গ্রামের গল্পে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য মূলত মানসিকতার পার্থক্য। গ্রামের মানুষের মানসিকতা শহুরে হয়নি।"[১৬]

ভগীরথ মিশ্রের মতে,

> "শহর ও গ্রাম বদলেছে। কৃষি প্রযুক্তি, ট্রাক্টর, বিদ্যুৎ টেলিভিশনের ব্যাবহারের ফলে এই পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম খুব তাড়াতাড়ি শহরের কাছে চলে এল। শহর চলে গেল গ্রামের কাছাকাছি। গ্রামের জীবন ও মানুষ বেশি মাত্রায় সাহিত্যে উঠে এল।"[১৭]

আফসার আমেদের মতে,

> "এই পরিবর্তনের ঢেউ এখন থিতিয়ে এসেছে। আশির দশকের গল্পে তার পরিচয় পাই। এখন শিল্প আর বাস্তবতার দিকে যাওয়ার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু। বৃহত্তর পাঠক সমাজ এ বিষয়ে জানেনা গল্প লেখকের কাজ তা জানানো নয়, এ বিষয়কে নিয়ে লেখা গল্পে জীবনকেই জানানো।"[১৮]

অমর মিত্রের মতে,

> "সত্তরের দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে প্রবল বেগে ছুটে এসেছে ১৯৬৮র খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরুকরে ১৯৭০-৭৫ এর রাজনীতি আন্দোলন পর্যন্ত সময়ে গ্রাম জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। হতাশা, ক্রোধ, নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে সামগ্রিক চেতনায়। গ্রামের দিকে ফেরার সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা ভিতরের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ের বদল ঘটে। মানুষ সম্পর্কে নতুন চিন্ময় দেখা দেয়। জমি ও সম্পৃক্ত মানুষকে ছোটগল্পে নতুন ভাবে দেখা হয়।"[১৯]

সত্তরের দশকের সব লেখকই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে কেউ কেউ ছিলেন। এই সময়কার গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন মনি মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষাল, বারিদ বরন চক্রবর্তী, রবীন্দ্র গুহ, অসীম গুহ, হীরালাল চক্রবর্তী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, তৃনাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, কানাই কুণ্ডু, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শংকর বসু, জয়ন্ত জোয়ারদার, মহিম রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অমর মিত্র, শ্যামল মজুমদার, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, কমল চক্রবর্তী, প্রভৃতি গল্পকারেরা। তাঁরা নিজস্ব ভঙ্গিমায় ছোটগল্পের আসরে অবতীর্ণ হন।

সুবিমল মিশ্র সমাজ পরিবেশের ন্যক্কার জনক দিকটিকে তুলে ধরেন। কানাই কুণ্ডুর গল্পে গ্রাম বাংলার অরণ্যময় আদিবাসী সমাজের অভাব অনটন এবং নিঃস্ব মানুষ গুলির বর্ণনা রয়েছে সমবেদনার সঙ্গে। সাধন চট্টোপাধ্যায় দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের জীবন যাত্রাকে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনিবেশ করেন। কখনও প্রকৃতি কখনও শ্রেণি বৈষম্য, নিম্নশ্রেণির ঐক্যহীনতা এবং খাদ্য সমস্যার কথা উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। শংকর বসুর গল্পে ধরা দেয় সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পন্দন। মহিম রায়ের গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতায় বাস্তব দিক গুলো প্রকাশিত হয়। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্পে দেখা যায় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার

আপ্রান চেষ্টা। অমর মিত্র গ্রাম অঞ্চল বা মফস্বলের জীবনকে শিল্পিত রূপ দান করেছেন তাঁর গল্পে। শ্যামল মজুমদারের গল্পে ব্যক্ত হয়েছে গ্রাম ও শহরের মানুষের চরম ব্যর্থতা এবং ভন্ড রাজনৈতিক নেতাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্যাঙ্গ ও বিদ্রূপের শলাকা। অভিজিৎ সেনের গল্পে পরিলক্ষিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমস্যা, সংকট এবং তার প্রতিবাদ। ভগীরথ মিশ্রের গল্পে সাধারণ দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিয়ে আসে স্বতন্ত্র এক মাত্রা। কমল চক্রবর্তীর গল্পে উঠে আসে পারিবারিক ও সামাজিক অসঙ্গতি। নারী-পুরুষ সম্পর্কের টানা পোড়েন এবং কলকারখানার সংলগ্ন এলাকার মাটির মানুষের কথাই তাঁর গল্পের বিষয়।

এ সময়ে রচিত গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল, মনি মুখোপাধ্যায়ের 'ইন্ডিয়ান পরি', চিত্ত ঘোষালের 'নিকষিত প্রেম', অসীম ত্রিবেদীর 'শিকড়', হীরালাল চক্রবর্তীর 'আবিস্কার', সঞ্জয় চক্রবর্তীর 'সৎকার', রবীন্দ্র গুহর 'কসাই', কানাই কুণ্ডুর 'বংশী বাইগার অভিষেক'। শৈবাল মিত্রের 'আতর আলির রাজ সজ্জা', মোহিম রায়ের 'শত ব্যাঘ্র প্রকল্পিত হোক', সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'যে দেশের রজনী নাই', অমর মিত্রের 'হারাধন', কল্যান মজুমদারের 'স্বপ্ন বিপনি', অভিজিৎ সেনের 'শুয়োরের রক্ত', 'দেবাংশী', ভগীরথ মিশ্রের 'হূলমারার ভমরা মাঝি', 'লেবারন বাদ্যিগর', কঙ্কাবতী দত্তের 'বোধিসত্তের মা', অশোক রঞ্জন সেন গুপ্তের 'আয়ুধ', 'দিনান্তে ভরের রবি', 'রাজা সাজার সাধ', রবীন্দ্র দত্তের 'অনুসন্ধানের ভূমিকা', 'শহীদ স্মৃতি', 'খনন কাজ', 'ধ্বংসস্তূপ', 'রঙিন মাছ' প্রভৃতি গল্প ছাড়াও আরও বহু গল্পকারের গল্প সত্তর দশকে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত গোটা সত্তর দশক টাই বাংলা ছোটগল্পর এক স্বর্ণভাণ্ডার। কেননা এই দশক মানেই মুক্তির দশক। একের পর এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে এই দশকেই যেমন, নকশাল বাড়ি আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, রাজনীতি, ধনতন্ত্রের বিকাশ, অর্থনৈতিক আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন, ভূমি সংক্রান্ত সম্পত্তিতে কৃষকের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ নিম্নশ্রেণির উন্নয়নের প্রক্রিয়া এই সময় থেকেই শুরু হয়। এর ফলেই সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখার সাহস সঞ্চিত করে। সময়ের বাস্তব চিত্র হিসেবে বাংলা

ছোটগল্পের ময়দানে অবতীর্ণ হয় এই সামাজিক চিত্রগুলি। এর ফলস্বরূপই এই সময়ের গল্প গুলি শুধুমাত্র গল্প হয়েই থেমে থাকে না পরিনত হয় ইতিহাসে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে আশির দশকে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাঁর গতি প্রকৃতি পূর্ববর্তী সমস্যা থেকে পৃথক নিশ্চয় কিন্তু সুদূর প্রসারী। এই দশকে এসে যেনসমস্যা কেন্দ্রকে খুব সহজে শনাক্ত করা যায় না। আবার মোটা দাগের ঘটনা গুলোও সরাসরি সাহিত্যে প্রভাব পরেনি, তবে পরোক্ষ ভূমিকা তো ছিলই। ১৯৮৪তে ৩১শে অক্টোবরে ইন্দিরা গান্ধীরও মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজীব গান্ধী বসেন প্রধান মন্ত্রীর আসনে। চারিদিকে অস্থির চঞ্চল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অতুলনীয় অবনতি। মাঝে মাঝে চলে আসা সাময়িক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এলাকা ভিত্তিক আহত হয় সাধারণ মানুষ। ওড়িশ্যা, তামিল নাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বিশাল এলাকা জুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হিমালয়ের ধ্বস নেমে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মহারাষ্ট্রে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। ১৯৮৪তে ভূপালে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হওয়াতে বহু প্রান নাশ হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে, তৈরি হয় কালোবাজার, আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ঘাটতি এবং বিদেশ থেকে গ্রহন করা হয় প্রচুর ঋণের বোঝা। এছাড়াও আরও বহু রাজনৈতিক ঘটনার সাপেক্ষে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিপূর্ণভাবেই দুর্বল হয়ে পরে। এর ফল স্বরূপ পরিলক্ষিত হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের পরিবর্তন। নব্বই এর দশকেও আগের দশকের অনুগামী চিত্রই চোখে পড়ে। সরকার কৃষি উৎপাদন জাত দ্রব্যের দিকে কিছুটা দৃষ্টিপাত করেন এবং সামান্য পরিমানে হলেও উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধিপায় বাৎসরিক হিসেবে। এই সময়ই বেসরকারীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্ত বাজার, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় ভারত। একই সময়ে পরিলক্ষিত হয় কিছু সামাজিক সমস্যাও। যেমন, সর্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে দুর্নীতি। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পরে রাজনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত।এমনই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ও গল্প রচনা

করেছেনগল্পকারেরা। তাই এসময়ের গল্পকারদের গল্পে সামাজিক বাস্তবের বহুমুখীনতা ফুটে ওঠে।

এই সময়ের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, হিমানীশ গোস্বামী, শৈবাল মিত্র, নলিনী বেরা, ভগিরথ মিশ্র, অনিল ঘরাই, কল্যান মজুমদার, রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, ঝরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, সমীর রক্ষিত, সমীর মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার সেনগুপ্ত, শচীন দাস, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, রবিশংকর বল, হর্ষ দত্ত, বাসুদেব দাসগুপ্ত, কিন্নর রায়, যশোদা জীবন দাসগুপ্ত, মিহির আচার্য, চিত্ত সিংহ, উদয়ন ঘোষ, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অজয় দাসগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষাল, সুলেখা সান্যাল, পবিত্র বল্লভ, রবীন্দ্র দত্ত, শুভমানস ঘোষ, সুব্রত নিয়োগী, অভিজিৎ সেন, নজরুল ইসলাম, তিলোত্তমা মজুমদার, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, অমিতাভ সমাজ পতি, মৃত্যুঞ্জয় সেন, জীবন ভৌমিক, অভিজিৎ তরফদার, সমীর রক্ষিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি গল্পকারেরা বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প কে বিশ্বের দরবারে পৌঁছেদেন নব নব ভাষায় এবং স্বতন্ত্রতায়।

এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জগতে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী লেখক অভিজিৎ সেন (১৯৪৫)। প্রথাগত ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা গল্পকারদের থেকে খানিটা স্বতন্ত্র ও বিপরীত ধর্মী গল্পকার। যার রচনায় জীবন অভিজ্ঞতা, শিল্পচেতনা এবং নতুন এক বিশ্ববীক্ষা স্ততন্ত্র শিল্প সার্থকতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর সংবেদন শীল হৃদয়ের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন সাংস্কৃতিক রাজনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গুলিকে এবং এই সময়ের সমাজ ও রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের দিকগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোনের মধ্যদিয়ে। সামাজিক সংকট, রাজনীতির ধ্বংসাত্মক রূপ, অর্থনীতির বিপর্যয় এবং সর্বোপরি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ গুলিকেই অধিক স্থান দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে। অভিজিৎ সেনের গল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন,

> "প্রায় অফুরন্ত অভিজ্ঞতার পুঁজিনিয়ে কথন বিশ্বে দ্বন্দ্বময় অন্তঃস্বরের গ্রন্থনা যেভাবে করেছেন তিনি তাতে স্বতশ্চল ভাবে স্তরে স্তরে সময়ের নানা বিভঙ্গ, অর্জন ব্যর্থতা, আলো অন্ধকার শূন্যায়তন ধরা পড়েছে। গল্পত্ব কাহিনিতে নেই রয়েছে বিন্যাসের মধ্যে।"[২০]

সত্তরের দশককে অভিজিৎ সেনের লেখালেখির প্রস্তুতির পর্ব বলা যেতে পারে। তাছাড়া তিনি নিজেও এই সময়ের লেখাকে অপরিনত বলে স্বীকার করেছেন, 'গল্প বিষয়ক ভাবনাচিন্তা নামক গ্রন্থে'। তবে তাঁর গল্পগুলি অনায়াসেই পরিনত হবে উঠেছে আশির দশকের গল্পগুলিকে। অভিজিৎ সেনের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'দেবাংশী'(১৩৮৮)। এই গল্পে তিনি লোকবিশ্বাস ও অলৌকিকতার অসংখ্য উপাদানকে সংগ্রহ করে শোষিত মানুষের জীবনার্তিকে এক বিকল্প বাস্তবতার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন চমৎকার ভাবে। অভিজিত সেনের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

> "অভিজিৎ ঐ সময়ের উত্তাপ শুষে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। দেখেছেন ব্যাক্তির সম্পর্ক নিছক ব্যাক্তিগত নয় কখনো, দেখেছেন সম্পর্কের আলো-অন্ধোকার, চড়াই-উৎরাই, কৌনিকতা উচ্চাবচতা কীভাবে সামাজিক বিধির রৈখিকতাকে অনবরত বিনির্মান করে চলেছে। এই সব দেখতে দেখতে গল্পকার অভিজিৎও তাঁর গল্পবিশ্ব পথ থেকে পথান্তরে আর রূপ থেকে রূপান্তরে বিবর্তিত করেছেন।"[২১]

শোষন এবং তার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ। লোক বিশ্বাস যে মানুষকে কিভাবে পঙ্গু, অসহায় করে তুলে, শোষণ, অবদমন এবং সর্বোপরি অন্যায়ের ছবিকেই তুলে ধরেন নিজস্ব নিত্য নতুন লিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দেবাংশী অলৌকিকতার

রূপকে বুঝতে পেরে ফিরে আসে এক রক্তে মাংসে গড়া মানুষে। হয়ে ওঠে প্রতিবাদী অন্যায়, অত্যাচার ও শোষকের বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিকূল বাস্তবতায় শোষিত সমাজের একমাত্র অবলম্বন। যাকে সাধারণ মানুষ নিজের সমস্ত দুঃখ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথা বলে কিছুটা আরোগ্য লাভ করতে পারে। বাখতিনের চিন্তা সূত্রে যাকে বলা হয়,

> "that the cornival is the place for working out, In aconcretely senseous, half real and half play acted form, a new modeof inter relationship between individuals, counterposed to the all powerful socio-hierachical relationship of non cornival life."[২২]

মূলত বহু আকাঙ্খিত শ্রেণি সংগ্রামের মূল বিষয়কে অনেক অধিক পরিমানে রক্তমাংসে পরিনত করেছেন। বলা যায় নিজের অন্তর্স্থল থেকে উঠে এসেছে তাঁর 'দেবাংশী' গল্পটি।

'ব্রাহ্মণ্য' (১৯৯৭) গল্পটি অভিজিতের এবং বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প হওয়ার দাবিদার। ধর্মীয় সংস্কার মানুষের রক্তের সঙ্গে কীভাবে আশ্রয় করে থাকে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পটি। 'নদীর মধ্যে শহর' (১৪০১) গল্পে মধ্যবিত্তের মানষিকতা ও শ্রেণিগত অবস্থানকেই তুলে ধরেছেন। 'মানুষের পিছনদিক' (১৪০১)গল্পের কাহিনি বর্ণনায় এক নতুনত্বকে তুলে ধরেন। গল্পের পাঠক বর্গকে শিহরিত করে তুলেন গল্পের কাহিনির মধ্যদিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ, রামমন্দির নির্মান এবং সর্বোপরি আনন্দ চরিত্রের দ্বিরালাপিক অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই গল্প। এছাড়াও তাঁর আরও বহু উল্লেখযোগ্য গল্প রয়েছে যা পাঠক বর্গের হৃদয়ে ছাপ ফেলার মতো। যেমন, 'মহাবৃক্ষের আড়াল', 'চিলানি মায়ের

গল্প', 'মার্চ মাসের হাওয়া', 'চোখে ঘুম নেই', 'দংশন', 'নৌবাহার', 'শরীর', 'কলাপাতা', 'মানব দেহের গৌরব', 'ঘ্রাণ', 'ধূমাৎ অগ্নি' প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময়কার শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যে আর একজন অন্যতম গল্পকার হলেন ভগীরথ মিশ্র(১৯৪৭)। প্রধানত গ্রাম জীবনের রূপকার এবং ব্রাত্য জীবনের কথাশিল্পী ভগীরথ মিশ্র। সামাজিক রাজনীতির বিষয়কে গ্রহন করে এক নতুন আঙ্গিকের মধ্যদিয়ে গল্পের বিষয় ও চরিত্রকে তৈরি করে নিয়েছেন। সত্তরের সময় পর্বে ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হলেও তাঁর গল্পবিশ্বে শুধুমাত্র ঐ সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটই সীমাবদ্ধ ছিলনা। সমাজ বাস্তবতার কঠোর ও কঠিন দিক গুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করতে থাকেন। শাসন ও শোষনের বাইরে বেড়িয়ে এসে লক্ষ রাখেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উপর। যার ফলেই তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শোষনের প্রবৃত্তিটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তাঁর নিজের মতেই,

> "শোষন তো দেখতে পারছি মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটা মানুষের মনোজগতে অঙ্কুরিত হয়, শাখা-প্রশাখা মেলে বাড়তে থাকে। সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ শোষন করে। মানুষের মনে সেই প্রবৃত্তিটা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন সে সুযোগ পেলেই তার চেয়ে দূর্বলকে শোষণ করবে।"[২৩]

ভগীরথ মিশ্রের দৃষ্টিচক্ষুর গভীরতা এবং মননশীলতা সত্যিই প্রশংষনীয়। কেননা গল্প তাঁর কাছে, 'কেবল কাহিনিই নয়। কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে আরও কিছু। একটা পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি, পরিশীলিত দর্শন। কাহিনিকে অতিক্রম করে আরো একটা দিগন্তকে স্পর্শ করা।'[২৪] ভগীরথ মিশ্রের গল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'পড়ুয়ার ছোটগল্প' নামক গ্রন্থের 'ভগীরথ মিশ্রের গল্প বিশ্ব' নামক নিবন্ধে বলেছেন,

> "ভূমি সংস্কারের জোয়ার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলকে বহুক্ষেত্রে সামন্তবাদী বদ্ধতা ও আধীপত্যবাদের মৌরসী পাট্টা থেকে মুক্ত করেছিল। তৈরী হচ্ছিল নতুন শ্রেণী চেতনা, ভেঙে যাচ্ছিল পুরণো সামাজিক বর্গায়তন গুলি। দেখা দিচ্ছিল নতুন মানুষের সম্ভাবনা....., ভাঙা চেতনা,অন্তর্ভূক্ত ও প্রকরণকে যারা বিনির্মান করেতে চাইছিলেন। সত্তরেরঅগ্নিস্নানের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সেই সব লিখিয়েরা আসলে প্রাতিষ্ঠানিকশক্তির বিরূদ্ধে দাঁড়িয়ে উপনিবেশের সাহিত্য বোধের জন্ম দিচ্ছিলেন। ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প যে চিহ্ন বিশ্বের পাঠ দেয়, তার সামাজিক উৎসএই প্রেক্ষিতে।"[২৫]

ভগীরথ মিশ্র এতদিনের ধারা বাহিক ভাবে চলে আসা ছোটগল্পের প্রচলিত অভ্যাসের গঠনকে ভেঙে দিয়ে, নতুন পথ খুঁজে বেরকরে এক অভিনব ছোটগল্পের ধারা তিনি পাঠক বর্গের কাছে তুলে ধরেছেন। মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশা করেছেন, মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যার ফল স্বরূপ নব নব ধ্যান ধারনার বিষয় নিয়ে রচনা করেছেন নতুন নতুন কাহিনি ও বিষয় নির্ভর ছোটগল্প। ভগীরথ মিশ্রের কাছে শোষক শোষিতের ধারণাটি এভাবে প্রকাশিত হয়,

> "দুনিয়ায় শোষক শোষিত বলে আলাদা আলাদা কোন মানুষ নেই,একটি মানুষের মধ্যেই একাধারে একজন শোষক ও একজন শোষিতমানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সে কখনো শোষক,আবার কখনো শোষিত।"[২৬]

এই শোষক ও শোষিতের দিকটিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'রাবণ' (১৯৯১) গল্পটির মধ্যদিয়ে। গল্পে চরিত্রহীন লম্পট জমিদার সতীকান্ত শোষক শ্রেণির অন্যতম প্রতিভূ। শোষিত রাবণও আপন প্রচেষ্টায় নিয়ে আসে ভাগ্যের পরিবর্তন। হয়ে ওঠে সতীকান্ত বাবুর মতোই জমিদার শ্রেণির মানুষ। সেও চালু করে গুড় মহাল, দরিদ্র শ্রমিকদের দাদন দেয়, সুদ নেয়, এভাবে ধীরে ধীরে সেও হয়ে ওঠে অর্থ সম্পত্তির মালিক এবং দেখা দেয় পরস্ত্রী কাতরতা। নজরে এসে পড়ে প্রহরাজ বেজের স্ত্রী। যাকে রাবণ বশীভূত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যে কোন কিছুর বিনিময়েই লাভ করতে চায় প্রহরাজের স্ত্রীকে। অবশেষে এই রমনীর জন্যই রাবণ প্রহরাজের মৃত্যু ঘটান। যে রাবণ ছিল শোষিত শ্রেণীর এক জন। আজ সেই রাবণই শাসক। যে লঙ্কা যায় সেই রাবণ হয় এই চির প্রচলিত প্রবাদটি এই গল্প প্রসঙ্গে যথাযথ। রাবণ নৃশংস ভাবে হত্যা করে প্রহরাজকে, তার মানবিকতাহীন বিবেক হীন মৃত্যু ঘটনাকে লেখল বর্ণনা করেন এভাবে,

> "চোখের ফাকে একজোড়া বিশাল গহ্বর। উয়ার মধ্যে কালো রঙের ঢেলা। তা বাদে লিঙ্গ, এ্যাঁড়কৃষাত্ত শতেক ছিদ্র করে সুড়ুং বানাইছে বিষ পিপঁড়ার দল।"[২৭]

ভগীরথ মিশ্র 'রাবণ' গল্পের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে রামায়ণের রাবন চরিত্রের মিল রেখে মানব মনের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত পর নারীর প্রতি অধিকার স্থাপনের বিষয়কে বিস্তর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

'কদম ডালিয়ার সাধু' (১৯৭৮) গল্পে এক সাধুর নাম করণ ও তার জীবনের চৌর্যবৃত্তির, ভিক্ষাবৃত্তির এবং ক্ষুধা নিবারণের মধ্যদিয়ে দারিদ্রসীমার নিচে ভিক্ষাবৃত্তি কারী মানুষের সংকীর্ণ জীবনধারা কে তুলে ধরেছেন। 'পুত্রেষ্টি' (১৯৮৮) তে মিথের ব্যবহার করেন তিনি। মানুষের নিজ স্বার্থ চরিতার্থতার নিপুণ ছলা কলাকে তুলে ধরেন। 'বিষ কর্পূর' গল্পে নিম্ন বর্গীয় মানুষের জীবন যাপনের জটিলতা, স্বার্থপরতা, দ্বন্দ্ব, বিবাদ প্রভৃতি

সমস্যার কথা উঠে এসেছে। এছাড়াও ভগীরথ মিশ্রের অন্যতম আরও বহু গল্প রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'গরু ঘাস খায়', 'নৌকাবিলাস', 'আত্মপীড়ন', 'অভিমন্যু', 'দৃষ্টি', 'বেড়িয়ে আসা', 'নেশা', প্রভৃতি।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৮) গল্পে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দূর্গম কঠিন বাস্তবতা, রাজনীতি, কৃষক সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় গুলি বর্ণিত হয়েছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন,

> "একজন লেখক কে বোধয় সময়, সময়ের চাপ নিজের সঙ্গে অভিঘাত লিখিয়ে নেয়। কিংবা কোন চরিত্র, কোন জীবন ঘটনা সঞ্জাত অনুভব বা কোন ভৌগলিক অবস্থানে জন মানস ও জন সমষ্টির জীবন যাপন, বেঁচে থাকা লোক কাহিনির ফল্গু ধারা ক্রমশ জরণ ক্রিয়ার মাধ্যমে লিখিয়ে নেয়।"[২৮]

ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বেড়িয়ে আসার কথাই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিজের জবানীতে বলেছেন। তাঁর রচিত গল্প গুলির মধ্যে বিশিষ্টতার দাবিদার 'জলের আয়না' (১৯৮৪)। এই গল্পে ভূমি সমস্যা এবং রাজনীতির ক্ষমতা প্রয়োগের বিভিন্ন দিক গুলি ফুটে উঠেছে। ঝড়েশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে দেবেশ রায় বলেছেন,

> "জীবন যাপনের ভীতর থেকেই ঝড়েশ্বর তাঁর গল্পগুলি ছড়িয়ে দেন। যেমন, পায়ে চলা পথ, চলে যায় জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে ও সে পথের কোন কোন অংশ হয়ত বাঁধানো হয়ে যায়। সেই কারণেই ঝড়েশ্বরের গল্পের এই জীবন এত বেশি রকম নির্দিষ্ট যেন ঐ জায়গা

জমি ছাড়া অন্য কোথাও ঐ জীবন যাপন ঘটতেই পারে না।”[২৯]

একারনেই বোধহয় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্পে ভূমি সমস্যা এবং শোষন ও শাসনের দিকটিকে তুলে ধরেন। ‘জলের আয়না’ গল্পেও তাঁর কোন বিকল্প হয়নি। গল্পের রায় বাহাদুর, সুরথ মৌলে, হারান লস্করদের শাসন পর্যায় ক্রমিক ভাবে জন্মগত হয়ে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায়। অপর দিকে পর্যায় ক্রমিক ভাবে শোষিত হয় কৃষক শ্রেণি, যাদের জন্য শুধুমাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য কিছু ফসল অথবা অর্থ প্রযুক্ত হয় মাত্র। ভাগ চাষির জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে অধিকাংশ কৃষক। তাদের সমস্ত জমি মালিকের দখলে চলে যায়। তারা জানেও না যে ভাগচাষে ভাগ দিলে মালিকের কাছ থেকে রশিদ নিতে হয়। রাজনীতির জটিল ঘেরাটোপকে সাধারণ অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণির মানুষেরা জানেও না বুঝেও না। তাইতো এদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সোজা সাপটা কথা,

‘মালিক বদলায়, আইন বদলায়, মাটি কিন্তু এক থাকে।’ বস্তুত ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই গল্পের মধ্যদিয়ে কৃষক শ্রেণির দৈন্যতার, অসহায়তার এবং হীনমন্যতার দিক গুলিকে হৃদয় ও মনন দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ফুঁটিয়ে তুলেছেন তাঁদের জীবন যাত্রা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তাকে। লেখক নিজে ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলের মানুষ হলেও নিজের লেখায় ফুঁটিয়ে তুলেছেন দীন-দরিদ্র, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ গুলোর দুঃখ, আর্তি, ধিক্কার এবং প্রতিবাদকে।

তাঁর রচিত ‘নোনা’ গল্পে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় সমাজের দৈনন্দিন অস্তিত্ব রক্ষার বিড়ম্বনা, বেচে থাকার লড়াই। ‘ভোটঘরে ঘড়ির কাটা’ গল্পে দলিয় রাজনীতির আলোচিত ও অনালোচিত বিষয়কে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের আরও বহু গল্প

রয়েছে। যেমন ‘প্রমীলা প্রবেশ’, ‘সিন্দুক’, ‘কাচের মেঘ’, ‘সঙ্গম’, ‘জাহাজ ঘাটা’, ‘পাহাড় পুরুষ’, ‘যোজনায় বৃক্ষ শিশু’ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রাম ও শহরের সমন্বয় সাধনকারী শিল্পী অমর মিত্র (১৯৫১)। গ্রাম জীবনের স্নিগ্ধ নীরবতা, শস্য শ্যামলতা, উদার মানসিকতা, দুঃখ সচেতনতা, হতাশা, সমস্যা এবং আন্দোলন প্রভৃতিকে তুলে ধরেন তাঁর গল্পে। পাশাপাশি শহর জীবনের বিষাদগ্রস্থতা, ক্লান্তি ও হতাশার চিত্র অঙ্কনেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গ্রাম ও শহর জীবন সম্পর্কে অমর মিত্র নিজেই বলেছেন,

> ‘‘কলকাতাকে আমি চিনতে পারতাম না মেদিনী পুর, বাঁকুড়া,উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ, চব্বিশ পরগনার গ্রাম না দেখলে আমি চিনতে পারতাম না প্রতিবেশী কন্যাটিকে, প্রতিবেশি পুরুষটাকে.....গ্রামে ফিরে দলিল দস্তাবেজ, চাষের জল, ধানের ফসল, অধিগৃহীতজমির ক্ষতি পূরণ না পাওয়া হতভাগ্য চাষী মানুষের সঙ্গেচায়ে চুমুক দিতে দিতে আলাপ জুড়ি।’’[৩০]

তিনি নিজের কাজের সুবাদে চলে আসেন গ্রামাঞ্চলে। আর এই প্রেক্ষাপটেই গ্রামের কৃষক ও শ্রমিক কে চেনার ও জানার সুযোগ পান। আর এই পটভূমিকে কাজে লাগিয়েই রচনা করেন ‘ডাইন’ গল্পটি। এই গল্পে কৃষক শ্রেণির সচেতনতার দিকটিকে তুলে ধরেন। কৃষক আন্দোলনের দিকটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যদিয়ে। সুযোগ সন্ধানী কিছু পয়সা ওয়ালা স্বার্থান্বেষী উচ্চ শ্রেণির মানুষের নিষ্ঠুর পদ্ধতিকে দেখিয়ে দেন। এখানেও বর্ণিত হয়েছে দাদন, ঋণ, বন্দক প্রভৃতি বিষয়। মহাজন শ্রেণির মানুষেরা কীভাবে ছলচাতুরীর মধ্যদিয়ে বেনামি জমি দখল করে রাখে। মুখোশ ধারি জমিদার, জোদ্দার, মহাজন দের মুখোশ খুলে দেওয়াই ছিল তাঁর গল্পের মূল উদ্দেশ্য। তিনি দেখিয়ে দেন ‘কাগজ কলমের সরকারী

নিয়মের বাইরে এই পৃথিবী।' জমিদারী অত্যাচার লাঠিয়াল বাহিনীর দলবল নিয়ে গিয়ে কৃষক শ্রেণির ফসল লুঠ করার চিরকালীন প্রথাগত অভ্যাসকে ভেঙে দেওয়ার নতুন রীতির কথা উল্লেখ করেছেন এই গল্পে ডাইন প্রতিবাদ করে এই অন্যায়ের এবং শোষণের বিরুদ্ধে,

> "বলিস কিন্তু পাপ হবে নি মেয়া মানুষের ? ..... আগে বাঁচ পরে পাপ, গাঁ বাচলে বড় পুণ্যি, শাঁখা সিঁদূর পরা থাকল নায়েক মানুষের ভিতর বাঁচি থাকে, বাবুগন ভয় পাবে,তদ্দিনে আর এক নায়েকের জন্ম হবে।"[৩১]

চরমবাস্তব সত্যকথাটি বলিয়েছেন গল্পকার হরি নায়েকের বৌয়ের(ডাইন)মধ্য দিয়ে। ভয়ভীতি, পাপ-পুণ্য, এ সবের চেয়ে বড় সত্য হল জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা। জীবনকে বাঁচানোর চেয়ে বা নিজে বেঁচে থাকার চেয়ে পাপ বড় নয়। বড় হতেও পারে না। অমর মিত্র এই গল্পের মধ্যদিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ডাইন চরিত্রের প্রতিবাদী সংলাপের মধ্যদিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন,

> "ডাইনের উপাস্থাপনা যেমন অনন্য, তেমনি রাজনৈতিক অবচেতনায় সম্পৃক্ত চিহ্নায়িত বাচনে ঋদ্ধ এর অন্তর্বস্তু। এর যাবতীয় প্রচলিতপ্রমানকে অস্বীকার করে হরি নায়েক কীভাবে কিংবদন্তি প্রতিমহয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্র যন্ত্র ও আর্থ রাজনৈতিক সমাজ উপস্থাপিত হয়। কার্নিভ্যালের উপকরণ হিসেবে সতর্ক পাঠক তা অবশ্য লক্ষ করেন।"[৩২]

অমর মিত্রের পরিবেশ ভাবনা, মত ও পথের সংঘর্ষের নির্ভর যোগ্য তাৎপর্য, নতুন দেশ ভাবনা, বিপ্লব ভাবনা, ব্যাখ্যা এবং প্রতিবাদ প্রভৃতিতেই পরিপূর্ণ তাঁর গল্প বিশ্ব। অমর মিত্রের একটি বিখ্যাত গল্প হল, 'মেলার দিকে ঘর', এই গল্পে তুলে ধরেন মানব মনের

আত্ম প্রতিষ্ঠার চরম প্রচেষ্টার দিকটিকে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্যবস্তুর যোগান যে কত বড় বাস্তব, তা তিনি এই গল্পে তুলে ধরেছেন। সেই বাস্তবতার জন্যই জন্মদাতা পিতাও যে নিজের সন্তান কে বিক্রি করতে পারে এই মর্মন্তুৎ বাস্তবতার চরম রূপকে গল্পকার বর্ণনা করেছেন তাঁর 'মেলার দিকে ঘর' গল্পে। 'দানপত্র' (১৯৮০) গল্পে ভূমি ও অরণ্যের অধিকারগত বিষয় বর্ণনা করেছেন। 'উড়োমেঘ' (১৯৯৩) গল্পে যৌনতা ও সৌন্দর্যের মিশ্রন ঘটিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং সেই ভাষা মানুষের মস্তিষ্কে যে কতটা ইফেক্ট করতে পারে সেই দিককে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত পক্ষে সমাজে বসবাসকারী রক্তচোষা দোধিচার দলের মুখোশকে খুলে দেওয়ার প্রচেষ্টাই তাঁর গল্পে মুখ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। সময়ই মানুষকে শিক্ষা দেয়, শিক্ষিত করে, প্রেরণা দেয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়ে আসে। গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র মানুষ গুলিকে শোষণ করার নিষ্ঠুর অমানবিক রূপকে গল্পের আখ্যানে অনাবৃত করে করে প্রকাশ করাযেন সময়ের নির্দেশ আর এই নির্দেশকে যথাযথ পালন করেছেন অমর মিত্র।

অনিল ঘড়াই (১৯৫৭) এই সময়েরই অন্যতম আর একজন গল্পকার। তিনি সাধারণত গ্রাম জীবনের রূপকার। গ্রামকে যতটা চেনেন জানেন ঠিক ততটাই কৌতূহল থেকে গেছে তাঁর শহর জীবনের প্রতিও। ষাটের ও সত্তরের দশকের গ্রাম দিয়ে শহরের পরিপূর্ণতার বিষয় গুলিতে যে কতটা রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে তারই বর্ণনা করেছেন তার বহু গল্পে। ভূমি, কৃষক, শোষণ, শাসন প্রভৃতি অনিল ঘড়াইয়ের গল্পেও উপস্থিত হয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রায়। তাঁর নিজের গল্প প্রসঙ্গে অনিল ঘড়াই নিজেই বলেছেন,

> "লেখক যেহেতু এক জনসমাজ বেষ্টিত মানুষ, অতএব এর পেছনেওএকটা ইতিহাস লুকিয়ে থাকে যা তার পারিবারিক, যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তার ব্যাপ্তি জীবনের মধ্যে যে ঘটনার ফুল গুলি উঁকি ঝুঁকি মারে, একান্তে তাকে ভাবায়, সেগুলিই একদিন গল্প হয়ে আত্ম প্রকাশকরেজনসমক্ষে। অতএব

> একজন লেখক কি নিয়ে লিখবেন, না লিখবেনতা সম্পূর্ণই তার নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। আরোপিত কোন কিছুই সেখানে প্রযোজ্য নয়। সন্মাদনাকে যদি একটা বহমান পাহাড়ি নদীর সাথে তুলনা করা যায় তাহলে হাজার সমস্যার পাথর ঠেলে সে এগিয়ে যায় সাগর সঙ্গমে। লেখকের কলম সেখানে ছিলা পিছলান তির নয়, বাহু ক্ষমতা সম্পন্ন মিসাইল।.....আমার লেখা লেখির মধ্যে অভাব-অনটন, দারিদ্র, দুঃখবোধ আর গ্রাম জীবন ঘুরে ফিরে আসে, কখনো আড়াল থেকে আমার মুখটাও সেখানে অসহায় বিবর্ণ এক ছায়া ফেলে।.....গদ্য কারের জীবনে ধারা বাহিক দুঃখই হলও শিরদাঁড়া, সোজা করে রাখার ধারাবাহিক ব্যায়াম। প্রতি নিয়তই ভাঙচুরের মধ্যদিয়ে গদ্যকার এগোতে থাকেন এবড়ো-থেবড়ো পাথুরে জমির উপর দিয়ে।”[৩৩]

প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য অনিল ঘড়াইয়ের গল্প সম্পর্কে বলেছেন,

> “শুধু কথা বস্তুর জোড়ে নয়, অনিলের বয়ান বিশিষ্ট হয়েছে গল্প ভাষার নিজস্ব নির্মানে। আর নির্মানের এই ধরণে খুঁজে পাই গল্পকারের জীবন ভাষ্য, তাঁর নান্দনিক ও সামাজিকঅবস্থানের হদিশ।”[৩৪]

বস্তুত অনিল ঘড়াই জীবনের বহমান ধারাবাহিকতার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা রহস্যের অনুসন্ধানের কথাই বলেন তাঁর গল্পবিশ্বে। ‘নুনা সামাডের গল্প’ তে দেখি একটি ছেলে ও তার মা বিবেকবান অত্মসর্বস্ব আত্মার প্রতীক হিসেবে উঠে আসে। অপর দিকে ছেলেটির পিতা অন্যতম আবশ্যক একজন শোষক চরিত্র। সর্বোদাই তার চরিত্র মহাজন

সুলভ আচরণ করেছে। নাবালক ছেলেটি তাঁর বাবাকে তুলনা করে নিরীহ ছোটজাতের পাখিকে শিকারকারী চিলের সঙ্গে। পরধন লোভী চিল স্বভাবি বাবার বর্ণনা দেন এভাবে,

> "লোভে বাবা এমন অর্থ কীট। জমি বিক্রির মোটা টাকা শহরের ব্যাঙ্কে সুদের ফুল ফুটিয়ে দিচ্ছে প্রতিমাসে.....নুনা সাডাম সরকারী জমিতে চাষ করে বছর বছর ফসলের ভাগদেয় বাবাকে, সার, জল, লাঙ্গল সব তাঁর। বাবা শুধু খবরদারির লাগামটা শক্ত হাতে ধরে বছর বছর শুষে নেয় একটা মানুষকে।"[৩৫]

সামন্ততান্ত্রিক শোষনের বিভিন্ন মাত্রাকে অনিল ঘড়াই তুলে ধরেছেন এই গল্পের মধ্যদিয়ে। শোষন ও শাসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মালিকানাহীন জমিদারীর কৃৎকৌশল ফুটে ওঠে তৎসঙ্গে অশিক্ষিত কৃষক, জ্ঞান বুদ্ধিহীন সহজ সরল সাধারণ মানুষের সরলতার দিকটি। তারা জানেও না যে, যে জমির ফসলের ভাগ দেয় জমিদারকে সে জমির প্রকৃত মালিক সে নয়। সে জমি বিক্রিত জমি, "আধিপত্য বাদীদের প্রতাপ নিজস্ব সাংস্কৃতিক রাজনীতি অনুযায়ী অন্তেবাসী জীবনের উপর কীভাবে যে চাপিয়ে দিতে চায় সত্যমিথ্যা ধারনা, ভালো-মন্দের সুবিধাবাদী ভাবাদর্শ, অনিল ঘড়াইয়ের 'গ্রাম দর্শন' সেই সত্যকে প্রকট করে তোলে।"[৩৬]

তাঁর রচিত 'পরীযান' গল্পে পালকির মালিকানা বদলে যাওয়ায় মুচিয়াদের পরিবারের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা, দরিদ্রতা এবং সর্বোপরি অসহায়তা চরমে পৌঁছায়। প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, পণপ্রথা এবং সর্বোপরি দারিদ্র মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইকে 'পরীযান' গল্পে তুলে ধরেন। দুজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে নিয়ে লেখেন 'চাতক' গল্পটি। এই গল্পে দেখানো হয় পরম স্নেহ ও ভালোবাসায় লালিত-পালিত করে সন্তানকে বড় করা। সেই সন্তানই আবার অসহায় বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কীভাবে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের

জন্য সার্থান্বেষী রূপ ধারণ করে তার এক পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করেছেন গল্পকার। 'বিলভাত' গল্পে বাদলা ও পুতলি নামের একটি পাগল ও পাগলির মধ্যদিয়ে দরিদ্রতা, প্রেম ভালোবাসা, রোমান্টিকতা পারিবারিক সম্পর্ক, মিলন, যৌনতা প্রভৃতি সব মিলিয়ে এক স্বতন্ত্র চমকপ্রদ কাহিনি তুলে ধরেন।

দিব্যেন্দু পালিত এই সময়ের আর এক জন চলমান জগতের বাস্তবতার মূর্ত কথাশিল্পী। ইনি একেবারে বর্তমান সময়ের যুবক যুবতির প্রেম ভালোবাসা, রোমান্টিকতা ও মনস্তত্ত্বের জটিলতা এবং সর্বোপরি প্রেম ভালোবাসার শুদ্ধ-বিশুদ্ধ দিক গুলিকে নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর গল্পে। দেহগত প্রেমের চরম অবক্ষয়ের দিকটিকে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বাস্তব সমস্যার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন 'একদিন অনেক রাতে'(২০০৪) গল্পে। এই গল্পে চুম্বন কে জীবিকা করা দুটি ছেলের কাহিনি এবং নিজের চাহিদাকে পরিপূর্ণতার জন্য যে সমস্ত মেয়ে বা নারীরা যৌবনকেও পন্য মনে করে ক্রয় করতে চায় সেই সামাজিক বিকৃত চরিত্র গুলিকে উল্লেখ করেন দিব্যেন্দু পালিত। বস্তুত তিনি সুবিধাবাদী ভোগ সর্বস্ব আত্মরতিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ব্যাঙ্গ ও শ্লেষ এর মধ্যদিয়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রতিষ্ঠ ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী গল্প লেখকেরা এই সময়ের গল্প প্রসঙ্গে বেশ কিছু মতামত জানিয়েছেন। যা এই সময়ের গল্প প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই সময়ের পূর্ববর্তী লেখকেরাও নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। নিম্নে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা হল ধারাবাহিক ভাবে।

দিব্যেন্দু পালিত জানিয়েছেন,

> "নতুন লেখকদের গল্পে আঙ্গিকগত ও বিষয়গত পার্থক্য ঘটেছে। এখনকার গ্রাম জীবনের গল্পে ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকের (অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের) গল্প

রীতির উপর জোড় পড়েছিল। স্টাইলটাই গল্প লেখককে অনেকটা গড়ে তুলেছিল। ষাট সত্তর দশকের গল্পে দেখা দিল নানা পরিবর্তন বিশেষ করে ভাষাগত পরিবর্তন। আশির দশকের গল্পে ভাষা সম্পর্কে সেই সচেতনতা কম। পঞ্চাশের দশকে একটা ঢেউ উঠেছিল, গল্পকে কবিতার কাছে আসতে হবে।”[৩৭]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান,

“গল্প লেখককে কবির মতই শব্দ সচেতন হতে হবে, চাই শব্দ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বোধ। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের গল্পে ছিল গভীরতা, ঐতিহ্য আর শিল্পীর নিঃসঙ্গতা। .....আজকে শহরের গল্প ও গ্রামের গল্পে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য মূলত মানসিকতার পার্থক্য। গ্রামের মানুষের মানসিকতা শহুরে হয়নি।”[৩৮]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আরও বলেন,

“এই নব্য আন্দোলনের মধ্যে আত্ম আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল।.....বহির্মুখিনতার চেয়ে তাদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্বকৃত আত্ম প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনাময় ভাব প্রবাহে তির্যক কিংবা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী।”[৩৯]

দেবেশ রায় জানান,

> "ছোটগল্পের একটা স্বাভাবিক প্রবনতাই থাকে বিশিষ্ট হয়ে যাওয়ারদিকে। নইলে একজন পাঠক একটা গল্প পড়তে যাবেন কেন?ছোটগল্পে চরিত্র ও ঘটনার এই বিশিষ্টতা অক্ষুন্ন রেখেও তাকে সার্বজনীনকরে তোলা লেখকের পক্ষে কঠিনতম কাজ। বাংলা সাহিত্যে এমনঅনেক গল্প লেখক হয়েছে, যে গল্পে লেখক ঐ বিশিষ্টতাকেই শেষ পর্যন্তবরণ করেছেন ।"[৪০]

দেবেশ রায় আরও জানান,

> "গত দশকের শেষার্ধে আরও অনেকের অনেক গল্পের সঙ্গে এই গল্পগুলিকেও নিয়ে বাংলা গল্পে আধুনিকতার আন্দোলনের একটা কথাচলেছে। সে আন্দোলন এই গল্প গুলির অব্যবহিত হলেও কেউ যেন দয়া করে তাকে 'নতুন রীতি' অভিধা দিয়ে না বসেন। ঐ অভিধা আমিস্বীকার করি না।"[৪১]

ভগীরথ মিশ্র সত্তর ও আশির দশকের গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "শহর ও গ্রাম বদলেছে। কৃষি প্রযুক্তি, ট্রাক্টর, বিদ্যুৎ, টেলিভিশনেরব্যবহারের ফলে এই পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম

খুব তাড়াতাড়ি শহরের কাছে চলে এল। শহর চলে গেল গ্রামের কাছাকাছি। গ্রামের জীবন ওমানুষ বেশি মাত্রায় সাহিত্যে উঠে এল।”[৪২]

আফসারআমেদের মতে,

“..... পরিবর্তনের ঢেউ এখন থিতিয়ে এসেছে। আশির দশকের গল্পেতার পরিচয় পাই। এখন শিল্প আর বাস্তবতার দিকে যাওয়ার প্রবনতাদেখা যাচ্ছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম বিষয় বস্তু। বৃহত্তর পাঠক সমাজ এ বিষয়ে জানে না। গল্প লেখকের কাজ তা জানানো নয়।, এ বিষয় নিয়ে লেখা গল্পে জীবনকেইজানানো।”[৪৩]

অমর মিত্র জানান,

“সত্তরের দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে গ্রাম প্রবল বেগে উঠে এসেছে। ১৯৬৮র খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭০-৭৫এর রাজনৈতিকআন্দোলন পর্যন্ত সময়ে গ্রাম জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। হতাশা, ক্রোধ,নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে সামগ্রিক চেতনায়। গ্রামের দিকে ফেরার সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা ভিতরের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ের বদল ঘটে। মানুষ সম্পর্কে নতুন চিন্ময় দেখা দেয়। জমি সম্পৃক্ত মানুষকে ছোটগল্পে নতুন ভাবে দেখা হয়।”[৪৪]

সমীর রায় চৌধুরীকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি পত্রাকারে লেখায়জানান

> "আমি মনে করিনা, মানিও না এই সময়ের হাংরি আন্দোলনেরকোন প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে।"[৪৫]

অজয় দাশ গুপ্ত বিমল করের 'ছোটগল্প নব নিরীক্ষা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> "অনুজ লেখকদের উজ্জীবিত করার জন্য এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে। কিন্তু তার উদ্যোগও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। না হওয়ারপ্রধান কারণ অনুজ লেখকদের হাত গুটিয়ে নেওয়া।"[৪৬]

তাই একথাই বলাযায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলা ছোটগল্পের ধারা একটি মাত্র বিষয়ের উপর নির্ভরশীল কোন দিনই ছিল না। সময়, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতির ধারাপথগুলি যেভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে বাংলা ছোটগল্পের ধারাও ঐ সব বিষয় গুলিকে অবলম্বন করে পর্যায় ক্রমিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কোন কোন গল্পকার দু-একটি গল্পে পুরাণ ইতিহাসকে অবলম্বন করলেও বাস্তবতার নিরিখেই তার কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু বলা যায় যে, গ্রাম, শহর, রাজনৈতিক বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সাধারণ মানুষ, মানুষের দরিদ্রতা, নিম্ন বর্গীয় প্রতিবাদ, কৃষি জীবির সমস্যা, বাস্তু সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, কর্মের সংস্থানের অভাব জনিত সমস্যা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা, কৃষি জমি সংক্রান্ত সমস্যা, ফসল সংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, বাসস্থান সমস্যা, সামন্ততন্ত্রের শোষণ, শাসন, প্রতাপ বা ক্ষমতা প্রয়োগ নীতি, হিংসাত্মক রাজনীতি, সামাজিক ধর্মীয় গোড়ামী, অন্ধ বিশ্বাস, পরিবার পরিজন, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, প্রেম, রোমান্টিকতা প্রভৃতি বাস্তব সমাজের সামাজিক সমস্যার পটভূমিতেই স্বাধীনতা পরবর্তী

সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগত অসংখ্য গল্প রচিত হয়ে এসেছে এবং এখনো হচ্ছে।

* স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অনন্যতা

পঞ্চাশের দশকেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখালেখির সূচনা হয়েছিল, তবে প্রথমদিকে যে মহাশ্বেতাকে আমরা দেখি, পরবর্তী দু'দশকে তাঁর লেখালেখি বাংলা সাহিত্যের জগতে এক বিশেষ অবস্থানকে সূচিত করেছিল।তবে মহাশ্বেতার ছোটগল্পের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু সংক্ষেপে দেখেনেব মহাশ্বেতার পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক নারী লেখিকাদের গল্পের বিষয় বস্তু কী এবং কেমন ছিল।

মহাশ্বেতার অগ্রজ গল্প লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব। দুই শতেরও বেশি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত অনবদ্য সৃষ্টি হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা' প্রভৃতি। বিখ্যাত গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল 'পাতাল প্রবেশ', 'ছিন্ন মস্তা', 'অভিনেত্রী' প্রভৃতি। 'পাতাল প্রবেশ' গল্পে আবেগ ও ভালবাসার এক বিচিত্র রূপকে বর্ণনা করেছেন এবং অন্তিমে উভয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি নারীর বাস্তবতার দিক গুলিকে স্বাভাবিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যদিয়ে। তবে সাধারণ বাস্তব কাহিনি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে অসাধারণত্ব লুকিয়ে থাকে সেই লুকিয়ে থাকা রহস্যকেই আশাপূর্ণা দেবী চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আর এই সুবাদে উঠে আসে নিপুন জোড়াতালির আটপৌরে সংসার, নিরাসক্ত নারী জীবন এবং অভিশপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাসর নানা বিষয়। অনেক নারী চরিত্রই সংসার এবং সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পরে অধিকারের লড়াইয়ে। কখনো পেয়েছে সহ্য হীন আঘাত কখনো হয়েছে রক্তাক্ত এবং কখনো কখনো জীবনও বলিদান দিতে হয়েছে নীল কণ্ঠের মতো অপ্রিয় বিষ পানের মধ্যদিয়ে। আশাপূর্ণার পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদেরঅবস্থানকে বুঝে নিতে চেয়েছে।

কবিতা সিংহ সাধারণত পঞ্চাশের দশকের এক জন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। কবিতার মধ্যদিয়ে পরিচয় লাভ করলেও গল্পের মধ্যদিয়েই সেই পরিচয় বিস্তৃতি লাভ করে। কবিতা সিংহের ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্যই হল নারীর লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অবমাননা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়া এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিবাদের দিকগুলিকে ফুটিয়ে তোলা। কোন কোন গল্পের নারী চরিত্ররা বল-বীর্যবান পুরুষের থেকেও পৌরুষ দীপ্ত হয়ে ওঠে। যেমন, 'খিদে' গল্পে নারীর লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অসহ্য অপমান ও নারীর যাতনার ছবিকে পাঠক মহলে তুলে ধরেন। 'চিত' গল্পে প্রেম, ভালোবাসা, নারীর পতিতা বৃত্তির কারণ, সমাজ দ্বারা ব্যথা-বেদনা, অপমান প্রভৃতি নারী বিষয়ক সামাজিক কিছু জটিল সমস্যাকে তুলে ধরেন। 'টুলির বড় দিন' গল্পে স্বামী পরিত্যক্ত নারীর জীবন যাত্রার জটিল সমস্যা গুলি কীভাবে চারদিক থেকে আবর্তিত হয় তার মূল রূপটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন। 'খেলতে খেলতে একদিন' গল্পেও পতিতা বৃত্তিকারী এক বেশ্যা নারীর জীবন কাহিনিকেই বর্ণনা করেছেন। কবিতা সিংহ মূলত বাংলা ছোটগল্পের আসরে নারী সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা এবং নারীকে শোষণের সামাজিক রাজনৈতিক দিক গুলিকে তুলে ধরে নারীচেতনা বাদের নতুন মূল্যায়নের দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন।

সুলেখা সান্যাল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম একজন ছোটগল্প লেখিকা। তাঁর গল্পের মূল বিষয় হল নারীর জীবন যাপন পদ্ধতির সামাজিক সমস্যা। সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে পরিবার পরিজনের অসহ্য দারিদ্রতার চরম রূপ এবং নারীর যৌন জীবন যাপনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবনতার দিক গুলিকে ফুটিয়ে তুলেন। তাঁর এরকমই একটি ছোটগল্প 'সিঁদুরে মেঘ' (১৯৯২)। এই গল্পে শোষক এবং শাসিতের ক্ষমতা প্রয়োগের চরম মাত্রাটিকে বর্ণনা করেন। অফিসের উচ্চ শ্রেণির পুরুষ কর্মচারীরা কিভাবে যে নিচু শ্রেণির নারী কর্মচারীদের শাসন এবং নির্যাতন করে তাঁর রূপ বর্ণনা করেছেন একটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি পারিবারিক দারিদ্রতা, অভাব- অনটন এবং সর্বোপরি অফিসের বড় অফিস্যারদের হাতে রাখার জন্য বাধ্য হয়ে নিচু শ্রেণির কাজে নিযুক্ত নারীরা হয়ে ওঠে উচ্চ পদস্থ পুরুষ কর্মচারীর শয্যা

সঙ্গিনী। এই সব বিষয়ই বার বার ঘুরে ফিরে আসে সুলেখা সান্যালের ছোটগল্পের মূল বিষয় হিসেবে। আবার অভাব এবং স্বার্থান্বেষী স্বামীর অর্থাৎ পুরুষ চরিত্রের চরম ব্যর্থতা এবং অনীহাকেও ছুরিকাঘাত করতে ছাড়েননি সুলেখা সান্যাল।

মূলত তিনি এই গল্পের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ের সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেন। কেননা এই সময়েই নারীরা কর্মের সন্ধানে বাইরে বেড়িয়ে আসে। অফিস আদালত থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। এছাড়াও সুলেখা সান্যালের আরও অনেক ছোটগল্প রয়েছে। যেমন, 'পঞ্চ তিলক', 'ছোট মাসী', 'খেলনা' প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই নারী নির্যাতনের, অসহায়তার এবং রাজনৈতিক ভাবে নারীর শিকারের দিক গুলিকেই উল্লেখ করেছেন স্নিগ্ধ প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর(১৯৫১) ছোটগল্পে উঠে আসে গ্রাম, শহর, অফিসের কর্মচারী, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা, মানুষের নিত্য নতুন সমস্যা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয় তার গল্পে পূর্ণ রূপ নিয়ে উঠে আসে। তিনি নিজেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় জানিয়েছেন,

> "আমার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। যৌবনে গ্রামকে দেখেছিখুব কাছ থেকে। একটা সময় আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যে প্রক্রিয়া ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারইপ্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। এই অনুভবেরই গল্প হল 'লজ্জাকুঠি', ঝড়ে কাক মরে', 'ক্যারাক্কাস', 'হনুমান', 'এ জীবন লৈয়াকী করিব', ও 'অ্যালুমিনিয়ামের ডানা'।"[৪৮]

তিনি আরও জানান,

> "গল্প কোনো ঘটনার ধারা বিবরণী নয়। ঘটনাটি হ'ল সেই ধূলোর কনিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাস্প ঘণীভূত, বৃষ্টি ফোঁটা তৈরী হয়। কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হল সেই শূককীট, গুটি পোকার মতন থাকে। ভালোবাসা ওকে প্রজা প্রতি করে। অথবা ছোট্ট কুঁড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে। আমার গল্প মানে সেই ইচ্ছে কুসুম ফোটানো।"[৪৯]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী মানবতা সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতার চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত। এ কথা তাঁর শুধু নিজের কথা থেকেই নয় নিজের লেখা গল্পও তাইই প্রমান দেয়। স্বপ্নময়ের নিজের রচিত 'ইচ্ছে কুসুম' গল্পে আমরা দেখতে পাই। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার এক বিভৎস রূপ। একটি মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করেই তাঁর গল্পটি রচিত। আকাশবাণীতে চাকরির অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন 'বাতিল রেকর্ড'। একটি নেড়ি কুকুরকে নিয়ে রচনা করেন 'আত্ম জীবনীমূলক রচনা'। এই গল্পে জীবনের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া কিছু মানুষ এবং জানোয়ারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। 'রক্ত' গল্পে শহরের কিছু মানুষের কুৎসিত ব্যবসা বানিজ্য, স্বার্থপরতা এবং রহস্যময় জীবন যাপন পদ্ধতিকে ভৎসনার সঙ্গে যেমন তুলে ধরেন তেমনি আবার জীবন ও প্রেমের দীর্ণ ব্যথা, বিরহ বেদনা কেও আর্তির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা' গল্পে গ্রাম্য মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব বোধ, মানবতার স্বীকৃতি এবং প্রতিবাদী রূপকে সমবেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তার বিখ্যাত আরও অনেক গল্প রয়েছে। যেমন, 'লাপিস লাজুলি' (১৯৯০), 'বেহেশতের কুঞ্জি' (১৯৯০), 'বিমলা সুন্দরী উপাখ্যান' (১৯৯২), 'ক্যারাক্কাস' (১৯৯২), 'লজ্জা মুঠি', 'ইতিহাস কথা' (১৯৯৭), 'গিরিবালার গল্প' (১৯৯৭), 'দেশের কথা' (২০০০), 'বাতিল রেকর্ড' (১৯৯৫), 'দুধ ওয়ালা' (১৯৯৬), প্রভৃতি।

নন্দিতা ঘোষ (১৯৬৯) এই সময়ের একজন নারী চেতনা বাদী লেখক হিসেবে পরিচিত। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবদমিত, অবহেলিত, নৈরাশ্য পিড়িত দিকটি উঠে আসে তার গল্পে। নারীর বিদ্রোহ এবং সুখ সর্বোস্ব পুরুষের চরম ব্যর্থতাকে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সুখ অসুখের গল্প' (১৯৯৪) নামক গ্রন্থের তেরটি গল্পে। এই গ্রন্থে নারী চরিত্রের সচেতনতা এবং বিদ্রোহ কে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে আক্রমন করেছেন পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে।

বস্তুত, শুরু আর শেষ বলে যেমন কোন বিষয় হতে পারেনা, তেমনি ব্যর্থ বলে কোন বিষয় থাকে না। আজ যে ব্যর্থ কোন একদিন চেষ্টার সক্রিয়তায় সেও জয় লাভ করে উঠবে। আর সেদিনই হবে তার সাফল্য। নারীর মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিদ্রোহের বিষয়ে এমনই একটি বার্তা বহন করে নন্দিতা ঘোষের ছোটগল্প।

উপর্যুক্ত নারী লেখিকাদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীও (১৯২৬) একজন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রখর শক্তিশালী লেখিকা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে জন্ম গ্রহন করলেও লেখিকা হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। সেই যে 'ঝাঁসির রাণী'র (১৯৫৬) হাত ধরে ঢুকে পড়েন বাংলা সাহিত্যের জগতে সে যাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু ঝড় ঝামেলার সৃষ্টি হলেও সব কিছুর উপরে বাংলা সাহিত্যের জগতে পর্বতের ন্যায় বিরাজ করছেন তিনি। একশোরও অধিক উপন্যাস এবং প্রায় তিনশোরও বেশি ছোটগল্প রচনা করে উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের। তবে সময়ের দিক থেকে অনুজ হলেও সাহিত্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিক থেকে মহাশ্বেতা পূর্বসূরিদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী এক লেখিকা। গল্পের বিষয় নির্বাচন, ভাষা, কাহিনি বর্ণনা, চরিত্র নির্মাণ এবং সর্বোপরি অতিরিক্ত রাজনৈতিক সচেতনতামহাশ্বেতার সাহিত্য জগতকে এক অনন্যতা দান করেছে। মহাশ্বেতার উপন্যাস ও গল্প গুলি পাঠ করলে তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসের কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত,

পঞ্চাশের দশকে বিমল কর 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' নামক মুখ পত্র নিয়ে আন্দোলনে নামেন। এই বিষয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। মহাশ্বেতা দেবী এই সময়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রীতির রিপোর্টাজ ধর্মী ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। মহাশ্বেতার এই সময়ের রচিত গল্পগুলির অধিকাংশ গল্পই রিপোর্টের আকারে রচিত। যেমন, 'মাদার ইন্ডিয়া', 'এম ডব্লু বনাম লখিন্দ', 'গিরিবালা', 'জল', 'ভাত', 'চিন্তা', 'আজীর', 'বিছন', 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী', 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ', 'নুন', 'মৃত্যুর কারণ', 'ভারতবর্ষ', 'বেহুলা', 'ময়না সতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনি', 'চোলিকা পিছে', 'তীর : ১৯৯৩', 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষে', 'অন্তত খাটূয়া', 'এইচ. এম', 'নেশা', 'বাঘের থাবা', বিশালাক্ষির ঘর' প্রভৃতি গল্প গুলির মধ্যে অনেক গল্পেই গল্পের চেয়ে তথ্যের পরিমান অনেক অধিক পরিমানে বর্তমান।

মহাশ্বেতার এরকমই একটি গল্প 'এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ'। এই গল্পের শুরুতেই বর্ণনাটি এমন "শুক্রবার, ৪ঠা জুন পদ্মমনি কলকাতা পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল ওর বর, দেওর, চার ছেলে, তিন মেয়ে। এতগুলো লোক নিয়ে কেউ দিদির বাড়ি এসে উঠেনা।"[৫০] আবার 'এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ' গল্পের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন ".....at present there is no statutory minimum wage for agricultural labourers in west Bengal"[৫১] এছাড়াও'এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ' এ মহাশ্বেতা গল্পের ঘটনার সাথে সাথে আগে দিন তারিখ এবং সময়কেও উল্লেখ করেছেন। অনেকটা সংবাদ পত্রের সাংবাদিকের মতো। যেমন,

১/ শুক্রবার, ৪ জুন,
২/ শনিবার, ৫ জুন,
৩/ রবিবার, ৬ জুন, সকাল,

৪/ রবিবার, ৬ জুন, রাত,

৫/ সোমবার, ৭ জুন, সকাল,

৬/ সোমবার, ৭ জুন, সন্ধ্যা,

৭/ মঙ্গলবার, ৮ জুন, ভোর, প্রভৃতি।

'ময়না সতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনি' গল্পও অনেকটা এই মাধ্যমে রচিত। দিন, তারিখ এবং সময় উল্লেখের মধ্যদিয়ে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী হয়ত সাধারণ পাঠক শ্রেণিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, এ কাহিনি নিছক কোন কল্পনা থেকে লেখা গল্প কাহিনি নয়। বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা দরিদ্র মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির ধারা বাহিক ঘটনা বলীকে নিয়ে রচিত গল্প কাহিনি। মহাশ্বেতার আরও অনেক গল্প রয়েছে যে গল্প গুলির শুরুতে এই রকম সংবাদ ধর্মী বার্তা রয়েছে। যেমন, 'দ্রৌপদী' গল্পের শুরুতেই,

> "নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি(নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকুড়া ঝাড়, কাঁদে ক্ষত চিহ্ন(দোপদি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারের সহায়তায় একশত টাকা"[৫২]

আবার 'রূদালী' গল্পের শুরুতে '

> "টাহার গ্রামটিতে গঞ্জু ও দুসাদরা সংখ্যাগুরু। শনিচরি জাতে গঞ্জু। গ্রামের সকলের মতো শনিচরীর জীবনও কেটেছে অসুমার দারিদ্রে। শনিবারে জন্মেছিল বলে ওর কপালে এত দুঃখ।"[৫৩]

দ্বিতীয়ত,

মহাশ্বেতার গল্প পাঠ করলে আর একটি স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটু গভীরভাবে মহাশ্বেতার গল্পগুলি পাঠকরলে আমরা দেখতে পাই তাঁর গল্প কাহিনির বিশ্লেষনের মাঝখানে হঠাৎ করে লেখিকা তাঁর লেখার মূল প্রেক্ষিতটাকে নিজের মতোকরে বলতে থাকেন এবং অপরাধীর শাস্তির দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নেন। ফলে মূল কাহিনি সেখানেই স্থগিত থাকে সাময়িক ভাবে। আবার যখন নিজের কথা শেষ হয়ে যায় তখন আবার গল্পের কাহিনি শুরু হয়ে যায়। এর ফল স্বরূপ পাঠকের অথবা গবেষকের নতুন করে ভাবনার জায়গা অনেকটা কমে যায়, শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করা ছাড়া। আর সে কারণেই পাঠক, গবেষক বা প্রাবন্ধিক মহাশ্বেতার ব্যক্তিগত জীবন অথবা লেখা সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চানতাহলে তাকে অতি আবশ্যিক ভাবে পাথেয় করে নিতে হয় তাঁর নিজের বলা কথাকে। মহাশ্বেতা নিজের গল্পের কাহিনির মূল নায়কের অথবা নায়িকার ভূমিকায় নিজেই উঠে আসেন অধিকাংশ গল্পের কাহিনির ক্ষেত্রে। মহাশ্বেতার এরকমই একটি গল্প 'স্তনদায়িনী'। এই গল্পের কাহিনি বর্ণনার মাঝখানে যশোদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> "পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে শস্যে, অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তান দের ক্ষুধা মেটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল্য ভাবটির কথা জ্ঞানী-মুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এই ভাবে নারী পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তারা করেছেন আদিযুগে, যখন অন্যদেশ থেকে তাঁরা এই পেনিন সুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুন এমনই যে, এখানে রমনীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল ভাবে আপ্লুত থাকে সকল পুরুষরাই গোপাল আর সকল রমনী নন্দরানী। এ ভাবটি যারা অস্বীকার করে নানা রূপ 'ইটার্নালশী'-'মোনালিসা'-'লা পাসিওনারিয়া'-সিমন দ্য বোভোয়া' ইত্যাদি পছন্দমতো

কারেন্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের উপরে সাঁটতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানা পোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়ে ছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তাঁরা বিপ্লবীনিদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরানীকেই চান। প্রসেসটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়ক দের সতত চারটি বেশি করে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎ চন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাত সরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধ্যেবেলা শান্ত মনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যারাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাদের জীবনে আমাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারনে বেল ফলটিতে তাদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। বেল ফল, থানকুনি, বাসক পাতাকে সমধিক গুরুত্ব দেইনা বলে আমরা যে কতকি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝিনা।

যাইহোক যশোদার জীবন কথা বলতে গিয়ে বারংবার বাইলেনে ঢোকার অভ্যেস ঠিক নয়।”[৫৪]

যশোদা যৌবন কাল থেকে শুরু করে অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত অনবরত সন্তান ধারণ করেছে। নিজের বুকের স্তনের দুধ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে। পালন করেছে পরিবারের গুরু দায়িত্ব, পঙ্গু স্বামী, অসহায় সন্তানদের লালন পালন করেছে। নিজের গর্ভে কুড়ি জন সন্তান ধারণ করেছে। আবার হালদার বাড়ির ত্রিশ জন সন্তানের পেটের ক্ষুধা মিটিয়েছে নিজের বুকের স্তনের দুধ দিয়ে, নীরবে মূক পশু গাভীর মতো করে। অথচ যশোদার কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ উঠে আসে নি। আর তাইতো লেখিকা নিজেই যশোদার হয়ে সোচ্চার ভাবে প্রতিবাদে নেমে পড়েন। ধারাবাহিক ভাবে বয়ে চলা গল্পের কাহিনির মাঝখানে পাঠককে জানিয়ে দেন,

> "বিশ্ব সংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না।"[৫৫]

যশোদা যখন নীরব অপ্রতিবাদী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী, সর্বস্ব দাঁতা হয়ে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তখন যেন লেখকই হয়ে উঠেছেন তাঁর চরিত্রের এক বিদ্রোহী ধ্বজাধারি সৈনিক এবং একটি প্রতিবাদী চরিত্র। লেখিকা নিজেই জানিয়েছেন পাঠক বর্গকে তাঁর এই সমস্যা শুধু একার নয় গোটা বিশ্ব সংসারেরই। বুঝতে অসুবিধা হয়না যে লেখিকা নিজেই যশোদা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার প্রতিবাদের দায়িত্ব তুলে নেন নিজের মাথায়।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প পাঠ করলে দেখা যায় তাঁর অধিকাংশ গল্পে এই ধরনের নিজস্ব মতামতপ্রকাশের প্রবনতা অনেকটা গল্পের পরিসর জুড়ে থাকে। ফলে মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি নিজেই লেখক, নিজেই পাঠক এবং শ্রোতা। এতে লেখকের বক্তব্যের দৃঢ়তা এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পরিচিত হন পাঠক ঠিকই কিন্তু তাঁর গল্পগুলি বিবৃতি ধর্মী হওয়াতে পাঠকের পরিসর কমে যায় এবং মনে হয় লেখক স্বর যেন তাকে সবসময়ই পরিচালিত করছে।

তৃতীয়ত,

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত গল্প গুলির মধ্যে অধিকাংশ গল্পেই ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতিতে লেখা। কোনো কোনো গল্প শুরু করেছেন সমাপ্তি থেকে। কোন কোন গল্প কাহিনির মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে। যেমন মহাশ্বেতার এ রকমই একটি গল্প, 'পদ্মিনী'। এই গল্পের শুরুতেই তার নিজস্ব মতামতের ভঙ্গিতে গল্পের প্রায় সমাপ্তির ভাবনার কথাই উঠে এসেছে,

> "নামেও রূপেও। ভাগ্য এবং লক্ষনের ফলাফলের বিশ্বাস করতেআমার বিংশ শতাব্দীর মন চায় না। তবু পদ্মিনীর কথা মনে পরলেকোন অলক্ষ্য শক্তির নিদারুণ পরিহাস প্রিয়তার কথাই মনে হয়। সে পরিহাসের দাম দিয়েছে সমর। কিন্তু পদ্মিনী কী দেয়নি?অনেক ভেবেছি মনে মনে কেমন যেন সঙ্গতি খুঁজে পাইনি। সঙ্গতিহয়তো সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু অবাধ্য মন হিসেব খোঁজে।"[৫৬]

গল্পের শুরুতে এই কথা গুলি শুনলে স্বাভাবিক কারনেই মনে হয় যে কোন কিছুর প্রসঙ্গে এই কথাগুলি এসেছে লেখিকার কাছ থেকে। কিন্তু প্রসঙ্গ ব্যাঘাত পরের প্রসঙ্গে। অর্থাৎ গল্পের কাহিনি এই কথা গুলির পর থেকে শুরু হয়েছে। 'দ্রৌপদী' গল্পেও একই পদ্ধতি লক্ষ করি। যেমন,

> "নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি(নিহত),নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়া ঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন(দোপদি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারের সহায়তায় একশত টাকা.....।"[৫৭]

এই 'দ্রৌপদী' গল্পের ভূমিকাও ফ্ল্যাশব্যাগ পদ্ধতিতে এগিয়ে গেছে। প্রথমে দ্রৌপদীকে ধরার জন্য ঘোষনা পত্র প্রচার এবং পরবর্তী সময়ে তার প্রতি এই ঘোষণার কাহিনি পাঠককে গল্পের আকারে জানানো হয়। মহাশ্বেতার এমন বহু গল্প রয়েছে ধারাবাহিক গল্প বলার পরিবর্তে ফ্ল্যাশব্যাগ পদ্ধতিকে গ্রহন করে গল্পের কাহিনি শুরু করা

এবং নিদিষ্ট একটি জায়গায় সমাপ্ত করা। যদিও বুঝতে অসুবিধা হয়না যে পাঠক সাধারণের মনকে একনিষ্টভাবে গল্পের দিকে আকৃষ্ট করাই এই পদ্ধতির মূল কারণ।

চতুর্থত,

গল্পের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মহাশ্বেতা দেবীর এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী যে আদিবাসী সমাজকে নিয়ে প্রচুর লেখা লেখি করেছেন এবং এই আদিবাসী জীবন নিয়ে রচিত গল্প গুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। তাঁর গল্পের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে তিনি শুধু তাদের জীবনের শোষণ, বঞ্চনার কথাই লেখেন নি তাদের যাপিত জীবনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সেই ক্ষমতায়নের প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন যা দিয়ে তারা প্রতিবাদ, প্রতিবাদের দূর্গ গড়ে তুলতে পারে। যেমন, 'দ্রৌপদী' গল্পটি শুধু অন্য গল্পকারই নয় বলা যায় মহাশ্বেতার সাহিত্য বিশ্বেও এই ধরনের গল্প একটাই আছে। অসহায় ধর্ষিত, নগ্ন, বিবস্ত্র রমনীর নগ্নতাই এই গল্পের প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে দেখা দেয়। এই অসহায় ধর্ষিত নারী চরিত্রকে দেখেও যে, বল বীর্যবান পুরুষ সেনা নায়কও ভয় পেতে পারে তাই দেখিয়েছেন মহাশ্বেতা 'দ্রৌপদী' গল্পে।

'শনিচরি'তে দেখতে পাই অন্য আর এক কাহিনি। এখানে শোষিত, লাঞ্ছিত, অনাহার ক্লিষ্ট শনিচরীর জীবন বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে গোটা সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের নারীর জীবন বৃত্তান্ত। শনিচরী গোহুমন বিবির জালে পা দেয়, ইট ভাটায় যায়, সেখানে দিন রাত ধর্ষিত – নির্যাতিত হয় এবং ভাটার ম্যানেজারের সন্তান গর্ভে নিয়ে ফিরে আসে। নিজের সমাজে ঠাই পায় না শনিচরী প্রভৃতি এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ গল্পের মূল বিষয়। গল্পের শেষে লেখিকার সদুক্তি ভাষণ উঠে আসে, যে গোহুমনের ফাঁসে পড়ে শনিচরীরা ইট ভাটায় যেতে বাধ্য হয়। এই গোহুমনই এক মাত্র গোহুমন নয় গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

আরও অজস্র গোহুমন। সুতরাং এই শনিচরীই একমাত্র শনিচরী নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনাহারক্লিষ্ট, হত দরিদ্র ঘরে বসবাস করা আরও অজস্র শনিচরী।

'স্তনদায়িনী'তে দেখা যায় আর এক ধরণের বিষয় ভিত্তিক কাহিনি। অভাব-অনটন, দারিদ্রতা এখানেও বর্তমান। তবে এই কাহিনিতে অভাব অনটন দূর করার অন্য আর এক মাধ্যম পরিলক্ষিত হয়। স্নেহময়ী মায়ের মাতৃত্বের প্রায় সবটুকুই তার নিজের সন্তানের জন্যই বর্তমান, অপর দিকে মায়ের মাতৃত্বের অধিকার থাকে শুধু মাত্র সন্তানের কিন্তু অদ্য গল্পে আমরা লক্ষ করি যশোদা হয়ে ওঠে প্রফেশনাল মাদার। সে তাঁর মাতৃত্বকে দিয়েই নিজের স্তনের দুধকে ধরে রাখে এবং হালদার বাড়ির সন্তানদের লালন পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে এটি শুধু মাত্র একটি কাহিনি হলেও মাতৃত্বকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম করা যায়, মহাশ্বেতা দেবীই তা আমাদের জানিয়ে দেন 'স্তনদায়িনী' গল্পটির মধ্যদিয়ে।

এগুলি ছাড়াও মহাশ্বেতার আরও বহু গল্প রয়েছে যেখানে নিত্য নতুন বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের কাহিনি। যেমন, 'সাঁঝ সকালের মা'তে মা এবং সন্তানের সম্পর্ককে নিয়ে রচিত একটি কাহিনি, 'রুদালী'তে দেখা যায় অসহায় শনিচরীর চোখের জল এবং কান্নাই হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের একটা বড় মাধ্যম। 'ডাইনী'তে দেখা যায় সমাজ থেকে ডাইন করে দেওয়া এক নারীর জীবন বৃত্তান্ত। 'বাঁয়েন' এ দেখা যায় বঞ্চিত এক নারীর অসহায়তা এবং পরিপূর্ণ সমাজ দরদী মনের মানসিকতার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দেশ ও মানব প্রেমের কাহিনি। এভাবেই মহাশ্বেতা বহুবিধ স্বতন্ত্র কাহিনি, চরিত্র এবং নতুন বর্ণনা মাধ্যম নিয়ে আসেন বাংলা ছোটগল্পে।

পঞ্চমত,

ভাষা ব্যাবহারের ক্ষেত্রেও মহাশ্বেতা দেবীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রথম পর্যায়ের লেখা ছোটগল্প গুলোর ভাষায় কিছুটা গতানুগতিকতা লক্ষকরা গেলেও সত্তর এবং আশির দশক থেকে তিনি আদিবাসী সমাজ নিয়ে গল্প রচনা শুরুর পর থেকে তাঁর ভাষায় পরিবর্তিত রূপ লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো আদিবাসী সমাজের আঞ্চলিক ভাষাকেও ব্যবহার করেছেন। যেমন 'দ্রৌপদী' গল্পের ভাষা,

> "জেলে পাগলা ঘণ্টি পরলে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগেযায় এবং সেনা নায়ক বিস্মিত হয়ে বেড়িয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখড় আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত্র সান্ত্রিরা তার কিছু তফাতে। একী? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।
>
> দ্রৌপদী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষতবিক্ষত। দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে তুর সাধানের মানুষ, দোপদি মেঝেন। বানিবে আনতে বলেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?.....দ্রৌপদীর কালো শরীরে আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনা নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুল কুলি দেবার মতো ভীষণ, আকাশচেরা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?
>
> চার দিকে চেয়ে দ্রোপদী রক্ত মাখা থুথু ফেলতে সেনা নায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড়

> মোরে পড়াতে দিবনা। আর কী করবি ? লেঃ কাঁউটার কর, লে কাঁউটার কর?
>
> দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনা নায়ক কে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনা নায়ক নিরস্ত্র তার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”[৫৮]

এখানে প্রচলিত বাংলা ভাষা ও আদিবাসী ভাষার মিশ্রন স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। আবার তাঁর প্রতিবাদের মাধ্যমও হয় স্বতন্ত্র ও ঋজু ধর্মী। তবে নাট্যমঞ্চে অভিনয়কারী রাজার হাসি যেমন হয় অট্টহাসি এবং ঐ হাসির মধ্যদিয়ে রাজার আনন্দ মুখর দিকটি আভিজাত্যের সঙ্গে দর্শকের কাছে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি প্রতিবাদের ভাষাও হতে হয় চড়া সুরের মেজাজি, কর্কট, রুক্ষ। আবার প্রেম নিবেদনের ভাষা হয় স্নিগ্ধ আবেগি, শান্ত মেজাজি ও ছন্দবদ্ধ। এই বোধ মহাশ্বেতার মধ্যে বজায় ছিল, আর তাই দ্রোপদির প্রতিবাদের ভাষা শানিত ইস্পাতের ফলার মতো।

তবে মহাশ্বেতা দেবী সব ধরনের ভাষাতেই গল্প রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন, ‘তালাক’, ‘কবিপত্নী’, ‘নববর্ষ’, ‘দাম্পত্য’ প্রভৃতি গল্পের ভাষার মধ্যদিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রকাশ করেছেন। ‘বাঁয়েন’ এর মধ্যে করুণা, মায়া-মমতা এবং স্নেহকে প্রকাশ করেছেন। তবে মহাশ্বেতার গল্পের প্রতিবাদের ভাষাই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে তাকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পরে যায় শর্মিলা বসুর কথা,

> “মেয়েদের ভাষা কোথাও কোথাও যে পুরুষের দীপ্তিমান ভঙ্গিকেও অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে তার স্বাক্ষর রয়েছে শ্রীমতি মহাশ্বেতা দেবীর রচনায়।.....কলমে যে মেয়েলি জগত সেন্টিমেন্ট এবং নিজস্ব উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য মহাশ্বেতা কখনোই তার অন্তর্গত নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে আশাপূর্ণাদেবী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মেয়েদের যে বিশ্ব

> নির্মান, মহাশ্বেতা সেই পৃথিবীর মানুষ নন। তাঁর শৈলী, তাঁর নির্মোহ বাস্তব চেতনা কখনো কখনো পুরুষ লেখককেও প্রতি তুলনায় আবেগি বলতে স্পর্ধা করতে পারে। সংহত জীবনায়নের এমন সুচারু প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের জোলো-আবহাওয়ায় বিরল।”[৫৯]

এই দ্বিরালাপ চারিতার মাঝামাঝি মহাশ্বেতা নিজে কি বলেছেন দেখে নেওয়া যাক,-

> “.....পুরুষের মতো লিখি না ? না। আমি আমিই। আমি আমার মতো লিখি। অন্য কোন ভাবে লিখতে পারি না আমি। সাহিত্য চর্চা আমার কাছে কিছু নিরন্তর সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। যন্ত্রণা, বেদনার, প্রশ্নের, আর্তির। আমার সম্পর্কে আমারই আরোপিত এই প্যাটার্নটিই চূড়ান্ত ও শেষ থাকুক এ যাত্রা। এ থেকে আমি মুক্তি চাই না।”[৬০]

যন্ত্রণা, বেদনা, প্রশ্ন এবং আর্তির কারণেই মহাশ্বেতার গল্পের ভাষা হয়ে উঠেছে তার পূর্ব নারী এবং পুরুষ লেখিকা ও লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র। অমলেন্দু বসু একটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন,

> “যাই বলোনা কেন মেয়েরা লিখতে পারে না। সাক্ষাতকার গ্রহন কারী মহাশ্বেতা দেবীর দৃষ্টান্ত দিলে তাঁর উত্তর ছিল, মহাশ্বেতা আবার মেয়ে হল কবে। আমি তো পূজো সংখ্যা গুলো খুলে চার পাশে পুরূষ লেখিকাদের ভিড়ে ঐ একটা লেখকের দেখা পাই।”[৬১]

অমলেন্দু বসুর এরকম বলার পেছনে অনেক কারণ ছিল। কেননা নারীর লেখায় সাধারণত ঘরের কাহিনি, ব্যক্তি জীবনের ও জগতের সুখ-দুঃখ, গৃহস্থ জীবন, বাস্তবতা প্রভৃতিই প্রত্যাশার যোগ্য। আর পুরুষের লেখায় অমলেন্দু বসুর মতো অনেকেই প্রত্যাশা করেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিবাদ। যা তিনি খুঁজে পেয়েছেন মহাশ্বেতার লেখনির মধ্যে। বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী সমাজ ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলিকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করেই থেমে থাকেন না। পাশাপাশি প্রতিবাদও করেন তাই ভাষায় প্রতিবাদের দৃঢ়তাও লক্ষনীয়।

মহাশ্বেতার বহু গল্প রয়েছে যেখানে তিনি লোক সংস্কৃতির প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনকেও ব্যবহার করেছেন। যেমন,

১. "মাসি পিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর/কখনো মাসি বলে না যে, খই মোয়াটা ধর।"[৬২]

২. "স্ত্রী লোকের জান কচ্ছপের প্রায়/বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না/পুড়বে নারী উড়বে ছাই/তবে নারীর গুন গাই"[৬৩]

৩. "মা হওয়া কি মুখের কথা?/শুধু প্রসব করলে হয় না মাতা।"[৬৪]

এছাড়াও মহাশ্বেতার বহু গল্প রয়েছে যেখানে তিনি লোক সংস্কৃতিতে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। বস্তুত তিনি উদ্ধৃত প্রবাদ গুলিকে ব্যবহার করেছেন সমাজ দ্বারা নারীর বঞ্চনা, অবমাননা এবং অবহেলার দিক গুলিকে দেখানোর জন্য।

ষষ্ঠত,

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও মহাশ্বেতার এক স্বতন্ত্রতা রয়েছে। মহাশ্বেতার পূর্ববর্তী লেখিকারা নারী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীর মৌলিক অধিকার, অবস্থান, প্রতিবাদী রূপ প্রভৃতিকে তুলে ধরেন নারী চরিত্রের মধ্যদিয়ে। কিন্তু মহাশ্বেতা তাঁর গল্প গুলিতে শুধু মাত্র নারী নয়, সমাজে বসবাসকারী নারী, পুরুষ, শিশু প্রভৃতি বঞ্চিত অবহেলিত জনের কথাই প্রকাশ করেন তাঁর গল্পের মধ্যদিয়ে। মহাশ্বেতার রচিত অধিকাংশ গল্পের নারী চরিত্ররাই নারী পুরুষের মধ্যে ভেদা ভেদকে বুঝতেই পারেনা। বিশেষত আদিবাসী সমাজকে নিয়ে রচিত গল্প গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য মহাশ্বেতা নিজেও এই কারণ সম্পর্কে বলেছেন,

> "আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ যাকে আমি বলি "voiceless section of Indian society" এই অংশ এখনো শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না"[৬৫]

বস্তুত মহাশ্বেতা হয়তো বা এই voiceless section of Indian societyর কথা উল্লেখ করার জন্যই নারী পুরুষের মধ্যে মিল অমিলের দিকটিকে ত্যাগ করে শুধু মাত্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কথাই উল্লেখ করেছেন। আর সে কারনেই 'অরণ্যের অধিকার' এর বীরসার আন্দোলন যতটা প্রভাব বিস্থার করে, ঠিক তেমনি ভাবে শনিচরী, দ্রোপদী, রুদালীর আন্দোলন ও প্রতিবাদও ততখানি প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে। একথা অনায়াসেই বলা যায় যে মহাশ্বেতা দেবী একজন অতিরিক্ত রাজনৈতিক সচেতন লেখিকা। তাই তাঁর গল্পের প্রধান উল্লিখিত বিষয়ের মূল বিষয় হয়ে দেখা দেয় রাজনৈতিক শোষণের অতি বিস্তর থেকে শুরু করে রাজনীতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক গুলি। যেগুলি আমরা মহাশ্বেতা না হলে হয়তো বা জানতেই পারতাম না।

সপ্তমত,

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল ইতিহাসের ব্যবহার। তবে তাঁর লেখায় ইতিহাসের ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অন্যান্য গল্পকার বা উপন্যাসিক দের থেকে। মহাশ্বেতা নিজেই বলেছেন যে,

> "……সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখকেরই মূল্যায়ন করা যায় না।……"[৬৬]

তিনি আরওবলেছেন,

> "ইদানীং কালে একটা কথা বার বার আমার সম্পর্কে শুনতে হয়, যে সত্তরের দশকে 'হাজার চুরাশির মা' থেকে নতুন পথ নিলাম কেন। এই ধারণাটি সম্ভবত আমার ক্ষেত্রে ঠিক নয়, সাধারণ মানুষে আমার আগ্রহ প্রথম থেকেই।……সাধারণ মানুষই যে ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা সে ধারনাও আমার বরাবরই ছিল। একই বিশ্বাস উৎস থেকে মোহনা অবধি সত্য আমার ক্ষেত্রে।"[৬৭]

মহাশ্বেতার গল্প এবং উপন্যাস পাঠ করলে আমরা ইতিহাস থেকে নিয়ে আসা উপকরণকেই লক্ষ করি, কোন রাজা রাজড়ার ঘটনা বিবরণকে দেখতে পাইনা। ইতিহাসের নতুন সংজ্ঞায়ন করেছেন তিনি।যাকে আমরা নব্য ইতিহাস নাম করণে ভূষিত করতে পারি,

যে ইতিহাস সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শোনা মুখের ইতিহাস। মহাশ্বেতা যে ইতিহাস পাঠ করেন না এমনটা নয় বরং বলা যায় তিনি ছিলেন ইতিহাস পাঠের অনুরাগী। তা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন,

> "ইতিহাস পাঠে আমার অনুরাগ এবং ব্যাপ্তি চিরদিনই ছিল। তার পরজীবন থেকে পাঠ নেওয়া শুরু হল, যা আমার লেখায় মূল ধারিত্রী সূত্র। হ্যাঁ, ইতিহাস চেতনাই আমার সমস্ত লেখাকে ধারণ করে আছে আর সেই জন্যে তথ্য নির্ভরতার প্রয়োজন আমার কাছে খুব বেশি। আমার প্রথম বই যেমন ঝাঁসিরানী, প্রথম উপন্যাস নটী, তেমনি আধার মানিক, অমৃতসঞ্চয়, কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, বিবেক বিদায় পালা, এমনকি এই কালের পটভূমিতে জল ও স্তনদায়িনী লেখার জন্য আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা বিচার করেছি, ব্যবহার করেছি। আমার লেখা যদি কেউ গুরুত্ব সহকারে পরেন, আমি মনে করি তাঁকে জমি, ভূমি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজ ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা শোষক ও শোষিতের মধ্যবর্তী অনেক শাখা প্রশাখার উপস্থিতি, এসব কিছুই জানতে হবে।"[৬৮]

মহাশ্বেতা ইতিহাস লেখার জন্য জনমানস থেকে লোককথা, লোক উপাদান সংগ্রহ করেন লোকবৃত্ত থেকে। যার ফল স্বরূপ তিনি ইতিহাসের প্রকৃত রূপকে জানতে পারেন এবং প্রকৃত কাহিনিকেই তিনি বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেন।

> "....a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past."[৬৯]

মহাশ্বেতার সর্বপ্রথম রচনা 'ঝাঁসীরানী' তে আমরা দেখতে পাই তাঁর নতুন ইতিহাস রচনার এক অন্যতম লক্ষন। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী বলেছেন,

> "This is not too difficult in a country where contemporary society is composed of elements that preserve the indeliable marks, of almost every historical stage. The neglect of suchanalysis leads to a ridiculous distortion of Indian history and to a misunderstanding of Indian culture, not compensated by subtle theology or the boasts of having risen above crass materialism."[৭০]

মহাশ্বেতা নিজেই 'ঝাঁসিরানী' রচনার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, "ঝাঁসীর রানী জীবনী লিখব এই ইচ্ছের প্রথম কারণ ছিল রানীকে ভালো লেগে যাওয়া। .....বই পড়ে ঝাঁসীর রানীর প্রেমে পড়েছি।"[৭১] এবং মহাশ্বেতা যে ঝাঁসীতে গিয়ে নিজেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে বিষয়েও মহাশ্বেতা নিজেই উল্লেখ করেছেন,

> "বই পড়ি। লিখি। মগ্ন হয়ে লিখি। বাপ্পা, যে অন্য সময়ে দুর্ধর্ষ দুরন্ত, সে মায়ের লেখা পড়ার সময়ে বিরক্ত করতে নেই তা জানত। এই ভাবে লিখে ফেললাম চারশো পাতা। তারপর পড়ি আর পড়ি। মন ভরে না। একদিন চারশো পাতাই ছিঁড়ে ফেললাম। বিজনকে বললাম, আমাকে যেতে হবে। স্বচক্ষে দেখতে হবে সে সব জায়গা। ১৯৫৩ সালের

> ইতিহাস কংগ্রেস আমেদাবাদে। প্রতুল গুপ্তর সহায়তায় তাতে যাই। 'ঝাঁসী' ম্যাপে একটি নাম। একদিকের ভাড়া দিলে ডবল টিকিট মিলে। কিন্তু টাকা কোথায়? আমার ও বীজনের মাথায় হাত। .....''[৭২]

ভারতের মহাবিদ্রোহের একজন অন্যতম নেত্রী রানী লক্ষ্মীবাঈ নীরব থাকতে পারেননি ইংরেজদের শোষণ, শাসন এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বীভৎস রূপ দেখে। দেশে বন্যা, মহামারী, অভাব এবং অর্থের ও খাদ্যের ঘাটতি, অপর দিকে ব্রিটিশদের দুঃসহনীয় নিয়ম নীতি অতিষ্ট করে তুলেছে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়কে। সে কারনেই সাধারণ মানুষ সচেতনতার সঙ্গে নেমে পরে বিভিন্ন বিদ্রোহে। কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুর, পালামৌ, লাতেহার, কৈতুর, ফরায়েজি বিদ্রোহ, দিদুমীরের বিদ্রোহ, মোপালা বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি বিদ্রোহ গুলিকে নিয়েই হয় মহাবিদ্রোহ, যার নেতৃত্ব দেন রানী লক্ষ্মীবাঈ।

বিভিন্ন ইতিহাসকারেরা রানী লক্ষ্মীবাঈ এর বিকৃত চরিত্র বর্ণনায় মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে গেছেন। সেখানে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অন্তরালে থেকে গেছে। কিন্তু মহাশ্বেতা তার ইতিহাস সচেতনতার মধ্যদিয়ে এক প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন, ঝাঁসীরানীর মধ্যদিয়ে। এই কাজ যতটা ছিল বিস্ময়কর ঠিক ততটাই ছিল মিথ্যে ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যার ফল স্বরূপ আমরা পেয়ে যাই,

> ''ঝাঁসীর লোক কথা, ছড়া, গান এবং প্রচলিত লোককথার সাহায্যে ঝাঁসীর রানীর যে মূর্তি নির্মাণ করেছেন তা ভারত ইতিহাসের ধারাকে কেবল সত্য পথে চালিত করেনি, ভারতবর্ষের মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের ঐশ্বর্যময় বিদ্রোহী অতীত, যে অতীত থেকে মানুষ পায় এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ।''[৭৩]

মহাশ্বেতার 'রোমথা'(১৯৬৪) গল্পেও বর্ণিত হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীর এক হতভাগ্য প্রেমিকের কাহিনি। নীহার রঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থপাঠের মধ্যদিয়ে এই গ্রন্থের আইডিয়া লাভ করেন। তাছাড়া গ্রন্থের শেষে রোমথার উৎস সম্পর্কে বলেছেন,

> "এই রোমথা প্রথার উল্লেখ আমি দুর্গাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস বইয়ে পেয়েছি। লক্ষণ সেনের আয়ুর্বেদ প্রসারে উৎসাহ প্রসঙ্গে তিনি ঘটনা টি উল্লেখ করেছেন।"[৭৪]

লক্ষণ সেনের আমলে রোমথা প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মৃত্যু দণ্ডে দন্ডিত আসামীকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হত। রাজ বৈদ্য এই আগুনে পুরে যাওয়া আসামীর শরীর থেকে তৈল নিঃসৃত করতো, যা থেকে তৈরি হত মহামাস তৈল বা মহামাস ঘৃত। এই ইতিহাসকে অনুসরণ করে মহাশ্বেতা লেখেন 'রোমথা' গল্পটি। ইতিহাসকে কীভাবে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নব নির্মান করা যায় মহাশ্বেতা তা দেখিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর এরকম আরও বহু উপন্যাস ও গল্প রয়েছে। যেখানে ইতিহাসের ব্যবহার করেছেন। যেমন, মহাভারতের দ্রৌপদীকে অনুসরণ করে রচনা করেন 'দ্রৌপদী'। কিন্তু এই 'দ্রৌপদী' গল্পে ফুটে উঠেছে সত্তরের দশকের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নগ্ন দিকটি। কেননা দ্রৌপদীর নগ্নতার মধ্যদিয়ে লেখিকা তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রের নগ্নতার দিকটিকে। রাজা বল্লাল সেনের কাহিনিকে অনুসরণ করে রচনা করেন 'চম্পা' এই গল্পেও রয়েছে নারীর আত্ম কথন এবং প্রতিবাদ। প্রভৃতি গল্পগুলি ছাড়াও, 'জল', 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ', 'মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ', 'মাতৃ মূর্তি', প্রভৃতি গল্প গুলিতে রয়েছে ইতিহাসেরই নবজন্ম।

অষ্টমত,

রাজনীতি সচেতনতা মহাশ্বেতা দেবীর ভাবনার ভিতমাটি তৈরি করেছে। বিস্তর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করার দিক থেকেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অন্যান্য উপন্যাসিক ও গল্পকারদের থেকে। মহাশ্বেতার গল্পের রাজনীতির মৌলিক মানেই হচ্ছে ক্ষমতার বিভক্তি করণের ছবি। যেমন, কেন্দ্র এবং প্রান্ত অর্থাৎ সমাজের পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষ, সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ড এবং সর্বোপরি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ জন। মহাশ্বেতা নিজেই উল্লেখ করেছেন,

> "স্বাধীনতা একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠ-বেগারী, কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তিপেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। ....."[৭৫]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মহাশ্বেতা আগাগোড়াই পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উপর নির্যাতন, শাসন, শোষণ, নিপীড়ন এ সব কিছুকে নিয়েই রাজনীতির বিভিন্ন দিককে বর্ণনা করেছেন।

মহাশ্বেতার পূর্ববর্তী গল্পকারের গল্পেরাজনীতির প্রসঙ্গ থাকলেও তাদের লেখায় প্রধান হয়ে ওঠে বিষণ্ণতা, নৈরাশ্যতা, নীরবতা। এদের গল্পে নিম্ন শ্রেণির কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষেরা নীরব ও নিরুত্তর ভাবে জীবন যাপন করে গেছে অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলার বা কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর ষাট ও সত্তরের দশকের গল্পের কাহিনি ঠিক এই প্রচলিত ভাব ধারার বাইরে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের দমন পীড়ন মূলক নীতির বিরুদ্ধে। কলম তুলে ধরেন তাদের জন্য যারা শহর থেকে অনেক দুরে বাস করেও শহুরে শোষণ থেকে মুক্তি পায় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হানা হানিতে অনিষ্ট ও ক্লিষ্ট গ্রামের

মানুষ। মহাশ্বেতার ভাষাতে বলা যায়, স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরেও সাধারণ দরিদ্র মানুষ নিরক্ষর, নিরন্ন এবং রাজনৈতিক ভাবে সচেতন বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা ব্যবহৃত। এই বিষয় গুলিকেই পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করেন মহাশ্বেতা। সুমিতা চক্রবর্তীর মতে মহাশ্বেতা,

> "সর্বোহারা মানুষেরা কীভাবে এক বিশাল গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পায়ে পায়ে এবং তলিয়ে গেছে অতলে তার বিবরণে তিনি শেষ করেন নি তাঁর কাজ। তাঁর গল্পে নিঃস্ব জনের ধীরে ধীরে সচেতন ও সংগঠিত হবার প্রক্রিয়াটি তুলে ধরেই তিনি থেমে যাননি। ..... তিনি স্পর্শ করেছেন এই আন্দোলনের অন্তঃ স্বরের মূল সামাজিক অসাম্যের রেখা টানা জীর্ণ ভূমি। সে ভূমিতে বহু ফাটল। সমাজের আদিবাসী, অন্তেবাসী মানুষদের নিজস্ব গোষ্ঠিতে হাজারো শোষণ, নারীর প্রতি অবিচার, বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস, ধর্মের নামে অন্তহীন প্রতারণা। সে সবই তুলে এনেছেন তিনি।"[৭৬]

বস্তুত মহাশ্বেতা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী নন, আবার কোন বিপ্লবী ধ্বজাধারী সৈনিক ও নন। নিজের বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও চিন্তাভাবনার মৌলিকতায় তিনি বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করেছেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে নকশাল বাড়ি আন্দোলন। ঝাঁসীরানী, সিধু-কানু, বীরসামুন্ডা বা নকশাল বাদী প্রভৃতি অখ্যাত নামা বিপ্লবী যুবকদের বুলেটের মালা বুকে নিয়ে নয়া জমানা আনবার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের বিপ্লবের সমস্ত অভিযান হৃদয়ের গহন গভীরে বহন করেছেন এবং গল্পের কাঁথারে কাঁথারে তা প্রকাশ করেছেন। মহাশ্বেতার উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মূল উদ্দেশ্য একটাই আর তা হল, দেশ একদিন সর্বোপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত হবে এবং এর জন্যই কাজ করে চলা। আর এই কাজের মধ্যদিয়েই মহাশ্বেতার বহু

উপন্যাস ও ছোটগল্প আজকের দিনে এবং ভবিষ্যতেও সমাজের দলিল হয়েই রক্ষিত হবে বাংলা সাহিত্যের জগতে। মহাশ্বেতার 'স্তনদায়িনী', 'সাঁঝ সকালের মা', 'দ্রৌপদী', 'শনিচরী', 'মাতৃমূর্তি', 'জল', 'বিছন', বাঁয়েন' প্রভৃতি গল্পগুলি সমসাময়িক সময়ের রাজনৈতিক চিত্রের একটা পূর্ণ মাত্রা নিয়ে এসেছে। মহাশ্বেতা নিজেই জানিয়েছেন,

> "শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার সকল লেখার প্রধান ভূমিকা। 'জল' গল্পের মাস্টার সৎবিবেকী কংগ্রেসি। 'এম. ডবলু. বনাম লখিন্দ' গল্পের কত মজুর আন্দোলন, সি. পি. আই. এর ঘনিয়নের নেতৃত্ব দত্ত আন্দোলন।..... আবার 'দ্রৌপদী' গল্পের নায়িকা আদিবাসী নকশাল কর্মী। মানসিকতায় এরা কোথাও এক এবং সেই একীভবন আমার কাছে স্ববিরোধী নয়।"[৭৭]

ভারতবর্ষে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে রক্ষণশীল রাজনৈতিক প্রভাব কতটা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নারীর উপর, মহাশ্বেতা তা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'সতী' উপন্যাসে। গল্পে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত রক্ষণশীল নীতির প্রতীক বিজয় মিশ্র। যার মধ্যে ঘরে ও বাইরে দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। বিজয় কম্যুনিস্ট পরিবারের একজন অন্যতম কমরেড, আদর্শবাদী নারী দরদী। যা শুধু মাত্র বাইরের রূপ, ভাষণ দেবার জন্য। কিন্তু বাস্তবে তার কানা কড়িও প্রয়োগ হয় না। এমনকি নিজের স্ত্রী সম্পর্কেও নিজস্বতা বোঝায় রাখতে বিরোধী হয়ে দাঁত, নোখ বের করে নিজের আসল রূপকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। আর তাতেই আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, 'এ দেশের মানুষের মনের অন্ধকার দূর করা কত কঠিন।'

অপরদিকে মলিনা হয়ে ওঠে আদর্শ ভারতবর্ষের একজন নারী চরিত্রের আদর্শ প্রতিমূর্তি। সে বুঝতে পারে সন্তান প্রসবের জ্বালা যন্ত্রনা কত গভীর। যে স্বামীর সন্তান

লাভের আনন্দানুভূতির জন্য তার এই করুন বাস্তবতার মুখোমুখি অথচ সেই স্বামীই নিদান কালে তার পাশে অনুপস্থিত । এখানে শারীরিক ভাবে বিকার গ্রস্থ মলিনা, বিজয় মিশ্র নয়। স্বার্থান্বেষি ক্ষমতা প্রতাপের মালিক বিজয় মিশ্র শুধুমাত্র আনন্দ অনুভবের জায়গাটাকেই শেয়ার করেন, কষ্টের, জ্বালা-যন্ত্রনার জায়গা গুলোকে নয়।

এই মলিনাই ভালো গল্প লিখত, এমনকি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর স্বামী। বাধ্য হয়েছে নিজের প্রতিভাকে লুপ্ত ও সুপ্ত করে রাখতে। তাইতো মলিনা সমাজের সন্মুখে স্বামীকে ত্যাগ করতে না পারলেও, মনে মনে চূড়ান্ত ভাবে স্বামী বিজয় মিশ্রকে নিজস্ব আত্মিক দিক থেকে একেবারেই ত্যাগ করেছে। যে রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা তার নিজের জীবনকে নিজের করতে দেয় নি। সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মলিনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছে। মলিনা জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে তথাপি বলেছে,

> "আজ বুঝতে পেড়েছি, চাপানো সতীত্বের চিতার আগুন কত ভয়ঙ্কর এবং বন্ধুকে অনুরোধ করেছে মরে গেলে আমাকে ভারতীয় সতী করে দিয় না তোমরা।"[৭৮]

এখানে মহাশ্বেতা পাঠক বর্গকে এক কঠিন প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেছেন সাম্যবাদী মতাদর্শের দুর্বলতা কোথায়। যা ব্যক্তি মানুষকে তার নিজস্ব জীবনে প্রাচীন মতবাদকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করে। এই দুর্বলতাকে ব্যক্তি বিজয়ের দুর্বলতা বললে হয়তোবা ভুল হবে, কেননা আমাদের চতুর্দিকে বহু বিজয় মিশ্র আছে যারা নারীর অসমতাকে স্বাভাবিক মনে করে।

ঘরকেই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে নেয়। যদি বেরতেই হয় তাহলে তাকে বহির্জগতেও ঘরের আদলে তৈরি করে নিতে হবে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নই যেন মহাশ্বেতার

হৃদয়ে নারা দেয়। আর সেই কারনেই মহাশ্বেতার নারী চরিত্ররা সমাজ বাস্তবতার প্রচলিত সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়ে এবং সর্বোপরি মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। তথাপি সমাজে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা রাজনীতির অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না।

মহাশ্বেতার এরকমই আর একটি গল্প 'দ্রৌপদী', এখানেও দৌপদী মেঝেন নিজের জীবন দিয়েও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, মেনে নেয় না তাদের দেওয়া শাস্তির পদ্ধতিকে। প্রতিবাদ তাদের দীর্ঘজীবি হয়েই থাকে। বিখ্যাত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার'এ একই পদ্ধতি বহাল থাকে । 'স্তনদায়িনী'তে যশোদা আবার দুই দিক থেকেই শোষিত। এক, যশোদার স্বামী তার নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যশোদাকে তৈরি করে প্রফেশনাল মাদারে। দুই, হালদার বাড়িতে দুধের যোগান দিতে হয়ে ওঠে দুধ মা। 'মাতৃ-মূর্তি' তে দেখান শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণির উপর উচ্চশ্রেণির নির্যাতন, শোষণ ও নিপিড়নের বিভিন্ন রাজনৈতিক দিক গুলিকে। এভাবেই মহাশ্বেতা তাঁর 'জল', 'অপারেশন বসাই টুডু', 'আজীর', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'এম. ডবলু. বনাম লক্ষিন্দ', 'বিছন', 'বায়েন', 'বান', 'শনিচরী', 'রূদালী, প্রভৃতি গল্পে রাজনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ দিক গুলিকে তুলে ধরে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নতুন মাত্রা দান করে। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও ঋজু ধর্মী ভাষাতে উচ্চারিত শব্দ গুলি যেন ধারালো তরোয়ালের মতোই ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা চিরাচরিত গল্প পদ্ধতিকে ফালা ফালা করে এগিয়ে যায় মহাশ্বেতার নিত্য নতুন পদ্ধতিতে রচিত গল্পগুলি।

মহাশ্বেতা দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি

জন্ম :

১৪ জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান, ঢাকা (বাংলাদেশ) মাতুলালয়ে। পৈত্রিক আদি নিবাস, গ্রাম- নতুন ভারেঙ্গা/ জেলা- পাবনা। পরে রাজশাহী শহর। পিতা:- মনীষ ঘটক (যুবনাশ্ব) (১৯০২-১৯৭৯), এবং মাতা:- ধরিত্রী দেবী (১৯০৮-১৯৮৪)। ভাইবোন:- শাশ্বতী (১৯২৯-১৯৯৫), অনীশ (১৯৩০-১৯৪৮), অবলোকিতেশ (১৯৩৩- ১৯৭৩), অপালা (১৯৩৫), সমীশ (১৯৩৮-১৯৮১), মৈত্রেয় (১৯৪১-২০০৩), সোমা (১৯৪২), শারী (১৯৪৫)।

শিক্ষা:

প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। ১৯৩০ সালে, ঢাকা ইডেন মন্তেসরিতে স্বল্প ক'দিন। ১৯৩৫- মেদিনীপুর মিশন স্কুলে কিছুকাল। ১৯৩৬-৩৮, শান্তিনিকেতনে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি। সে দিনের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও শিক্ষাভবন (কলেজ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ১৯৩৯-৪১ এ অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস। ১৯৪৪ সালে আশুতোষ কলেজ (মহিলা বিভাগ) থেকে আই. এ.। ইংরাজি অনার্স নিয়ে বি. এ. ১৯৪৬ সালে, শান্তি নিকেতন কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩তে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.।

ব্যক্তিজীবন :

বিবাহ, ২৭/০২/১৯৪৭ সালে, অভিনেতা, নাট্যকার, লোকগীতি রচয়িতা ও গায়ক ভারতীয় গন নাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮)

সঙ্গে। একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের (বাপ্পা) জন্ম ২৩/০৬/১৯৪৮। বিজনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯৬২ সালে। অসিত গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ ১৯৬৫ সালে। বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯৭৬ সালে।

জীবিকা :

কলকাতার 'পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন'এর প্রাত: বিভাগে শিক্ষকতা ১৯৪৮-৪৯। ১৯৪৫-৫১ তে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্টজেনারেল। পোষ্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্ক। কাপড় কাচার সাবান বিক্রি এবং টিউশনি ১৯৫১-৫৭। ১৯৫৭ সালে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে একবছর শিক্ষকতা। ১৯৬৪তে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৮৪ সালে কলেজ থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহন।

লেখা শুরু :

প্রথম মুদ্রিত লেখা খগেন্দ্র নাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে। বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' নামক বই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসির রানি' ১৯৫৬ সালে। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'নটী' ১৯৫৭ সালে। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'কি বসন্তে কি শরতে' ১৯৫৯। 'ঝাঁসির রানি' লেখার পর থেকে বই লিখে অর্থোপার্জন শুরু।

লেখালেখি :

গল্প উপন্যাসের বাইরে সাংবাদিকতা ও অন্তর্তদন্তধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বাংলায় যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায়। ইংরেজিতে, ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলি (মুম্বাই), বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সানডে, ফ্রন্টিয়ার, অমৃত বাজার পত্রিকা, নিউ রিপাবলিক (রাঁচি)। যোজনা কমিশন প্রকাশিত 'যোজনা' ও ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর আয়োজিত দাদন বদ্ধ মজুর ও দেশান্তরী মজুর বিষয়ে বিশেষ প্রবন্ধ।

পত্রিকা সম্পাদনা :

১৯৮০সাল থেকে ত্রৈমাসিক 'বর্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনা। পত্রিকাটি আদিবাসী ও অন্যান্য সমাজ বিষয়ে তথ্যবাহী সমাজ-সমীক্ষামূলক, মূলত সমাজের নিঃস্ব অংশের।

পুরস্কার :

চৈতন্য লাইব্রেরী পুরস্কার ১৯৫৮, শিশির কুমার ও মতিলাল পুরস্কার ১৯৬৮, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, শরত স্মৃতিপদক ১৯৭৮, ভুবন মহীনি দেবী পদক১৯৮৩, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৭৯, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য কর্তক প্রদত্ত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য স্বর্ণপদক ১৯৮১। ভারতসরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' ১৯৮৬, জগত্তারিণী পদক১৯৮৯, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার১৯৯০, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ১৯৯৬, ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ১৯৯৭, সান্মানিক ডক্টরেট রবীন্দ্র ভারতী ১৯৯৮, ফেলোশিপ:বোম্বে, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৮, ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার (দিল্লী) ১৯৯৮, তিরূপতি মহিলা ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯, ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯, দেশিকোত্তম – বিশ্বভারতী ১৯৯৯, সান্মানিক ডি. লিট. ছত্রপতি শাহুজী মহারাজ ইউনিভার্সিটি কানপুর, ২০০০, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার ২০০১, ভারতীয় ভাষাপরিষদ সন্মান ২০০১, গান্ধী আম্বেদকর ট্রাস্ট প্রদত্ত জ্যোতিবা পুলে সরত পুরস্কার ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

বিদেশ যাত্রা:

১৯৮৫- ভারত ও ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি উপলক্ষে প্যারিস।

১৯৮৬- ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান, পশ্চিম জার্মানি এবং লন্ডন ভ্রমণ ও বক্তৃতা।

১৯৮৮- আমেরিকার মার্কসিস্ট লিটারারিগ্রুপের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা

গমন। এ বছরই অনুষ্ঠান হয় পিটসবার্গ কার্নেগীমেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৯০-ডিসটিংগুইশড ফুলব্রাইট লেকচারার হিসেবে আমেরিকা গমন।

১৯৯২-ফ্রান্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে 'তৃতীয় বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জেনিভা গমন।

১৯৯২-ফ্রান্সে এইকস অঁ-প্রভঁসে বাঙালি লেখকদের সঙ্গে গমন, আহ্বায়ক এইকসের সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা ও ফরাসী সংস্কৃতি মন্ত্রক।

১৯৯৮- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ উপলক্ষে প্যারিস গমন।

২০০২- centre national do livre, বা সঁনস নাসিওনাল ডু লিভরে, (জাতীয় পুস্তক কেন্দ্র) ফ্রান্সের আমন্ত্রনে দু-সপ্তাহের জন্য ফ্রান্স গমন। ভারতীয় লেখকদের একটি দল, যাঁরাভারতীয় ভাষায় লেখেন, ভারতীয় হলেও ইংরেজিতে লেখেন, তারা আমন্ত্রিত হয়ে ছিলেন। যোগসূত্র একটাই: এঁদের সকলের লেখাই ফরাসি ভাষায় অনুদিত ও জনপ্রিয় হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' ফরাসিতে 'লা মেরে দু ১০৮৪' নামে অনুদিত হয়েছে।

জনকল্যাণ :

আদিবাসী ও অন্যান্য নানা সংগঠনের সঙ্গে কখনো প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে কখনো পরামর্শদাতা রূপে কখনো বা সক্রিয় ভাবে যুক্ত । যথা: ১. পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা। ২. সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তিমোর্চা। ৩. পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর জন কল্যান সমিতি, ৪. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যান সমিতি। ৫. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যান সমিতি (মেদিনীপুর)। ৬. পশ্চিমবঙ্গ কল্যান সমিতি (পুরুলিয়া)। ৭. পশ্চিমবঙ্গ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি। ৮. পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যান সমিতি(পুরুলিয়া)। ৯. মাঝগেড়িয়া আদিবাসী গাঁওতা সুসাই বাইসি(বাকুড়া)। ১০. সান্তাল সমাজ লাআন্তি বাইসি(মুর্শিদাবাদ)। ১১. ভারতের আদিম জাতি(মধ্যমগ্রাম)। ১২. পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যান সমিতি(কাঁচরাপাড়া)। ১৩. দলিতজন মুক্তি সংগঠন (শিবপুর হাওড়া)। ১৪. কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ(সিংভূম)। ১৫. মুন্ডা সমাজ সাঁওয়ার জামদা (ওড়িশা)। ১৬. আদিবাসী ও হরিজন কল্যান সমিতি। ১৭. ২৪পরগনা আদিবাসী কল্যান সমিতি (সোনাপুর)। ১৮. বহরমপুর পৌর হরিজন কর্মী

মজদুর সংঘ। শরীর ও স্বার্থের কারণে এই সংগঠন গুলির মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ খেড়ুয়া শবর কল্যান সমিতি' ছাড়া অন্য গুলির সঙ্গে এখন আর সক্রিয় ভাবে যুক্ত নন। ১৯. পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যান সমিতি(১৯৯৮)। ২০. সর্বোভারতীয় ডিনোটিফায়েট এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি/ডিনোটিফায়েট অ্যান্ড নোমাডিক ট্রাইবস রাইট অ্যাকশান গ্রুপ/ডি. এন. টি. র‍্যাগ, মার্চ ১৯৯৮। ব্রিটিস আইন ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট ১৮৭১ অনুযায়ী ভারতে ২০২টি গোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লোধা (মেদিনীপুর), খেড়িয়া শবর(পুরুলিয়া), ঢেকারো(বীরভূম) 'অপরাধ প্রবণ' বলে ১৮৭১-১৯১০ এর মধ্যে ঘোষিত, বা 'নোটিফায়েট' বা 'বিমুক্ত' বলে ঘষিত হয়। কিন্তু লোধা, খেড়িয়া সহ ভারতে সর্বোত্র এরা আজও পুলিশ ও সমাজের চোখে জন্মাপরাধী বলে নির্যাতিত, নিহত ও উপেক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়াতে বুধন শবর হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যান সমিতি যে মামলা করে, ভারতে তা ডি. এন. টি. হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। এই 'কেস' এর পরেই বরোদাতে ডি. এন. টি. র‍্যাগ গঠিত হয়। এই সংগঠন 'বুধন' নামে ইংরেজি পত্রিকাও বের করতে শুরু করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যভারত ও রাজস্থান ঘুরে ঘুরে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করে। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর ফলে অনেক সুবিচার মেলে। এটি মহাশ্বেতার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এ জন্য বছরে ৮/১০ বার বরোদা হয়ে অন্যরাজ্য ভ্রমন এখনো জারি আছে। এ কাজে বরোদার গণেশ দিভী সহ অন্যান্য ভারতীয় মানুষ যুক্ত আছেন। ডি. এন. টি. মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত গ্রন্থাবলী

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত গ্রন্থগুলি গ্রন্থাকারে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকাল অনুযায়ী ধারাবাহিক সাঁজিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকরা হয়েছে।

১. ঝাঁসির রানি-প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ নিউ এজ - ১৯৫৬

উপন্যাস:

২. নটী প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নিউ এজ - ১৯৫৭
৩. যমুনা-কি তীর বসুধারা প্রকাশনী - ১৯৫৮
৪. মধুরে মধুর এ. মুখার্জী - ১৯৫৮
৫. তিমির লগন করুনা প্রকাশনী - ১৯৫৯
৬. এতটুকু আশা করুনা প্রকাশনী - ১৯৫৯
৭. প্রেমতারা এম. সি. সরকার - ১৯৫৯
৮. পরম পিপাসা ডি. এম. লাইব্রেরী -১৯৬০
৯. রূপরাখা করুনা প্রকাশনী- ১৯৬০
১০. তারার আঁধার কথাকলি - ১৯৬০
১১. সন্ধ্যার কুয়াশা মিত্র ও ঘোষ - ১৯৬২
১২. লায়লী আশমানের আয়না করুনা প্রকাশনী - ১৯৬২
১৩. অমৃত সঞ্চয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড - ১৯৬২
১৪. বায়োস্কোপের বাক্স মিত্র ও ঘোষ - ১৯৬২
১৫. দিনের পারাবার ডি. এম. লাইব্রেরী - ১৯৬৪
১৬. অজানা অমর সাহিত্য প্রকাশন - ১৯৬৫
১৭. আঁধারমানিক মিত্র ও ঘোষ - ১৯৬৬
১৮. তীর্থ শেষের সন্ধ্যা সংযোগ - ১৯৬৬
১৯. বিপন্ন আয়না ডি. এম. লাইব্রেরী - ১৯৬৬

২০. দুস্তর করুনা বুক এজেন্সি - ১৯৬৭

২১. কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু চতুস্পর্ণা - ১৯৬৭

২২. স্বামীর ঘর উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির - ১৯৬৮

২৩. ধানের শীষে শিশির করুনা প্রকাশনী - ১৯৭২

২৪. হাজার চুরাশির মা করুনা প্রকাশনী ১৯৭৪

২৫. স্বাহা বাণী শিল্প - ১৯৭৭

২৬. অরণ্যের অধিকার করুনা প্রকাশনী - ১৯৭৭

২৭. ঘরেফেরা শরৎ পাবলিশিং- ১৯৭৯

২৮. চোট্টিমুন্ডা এবং তার তীর করুনা প্রকাশনী - ১৯৮০

২৯. শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা(একত্রে ২টি উপন্যাস করুনা প্রকাশনী - ১৯৮১
শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা, সরসতীয়া)

৩০. অক্লান্ত কৌরব নবপত্র প্রকাশন - ১৯৮২

৩১. পলাতক নবপত্র প্রকাশন - ১৯৮৩

৩২. বিবেক বিদায় পালা মন্ডল বুক হাউস - ১৯৮৩

৩৩. সুরজ গাগরাই সমকাল প্রকাশনী - ১৯৮৩

৩৪. তিতুমীর সমকাল প্রকাশনী - ১৯৮৪

৩৫. শৃঙ্খলিত শরৎ পাবলিশিং - ১৯৮৫

৩৬. আশ্রয় মন্ডল বুক হাউস - ১৯৮৫

৩৭. স্বেচ্ছাসৈনিক নবপত্র প্রকাশন - ১৯৮৬

৩৮. নীল ছবি করুনা প্রকাশনী - ১৯৮৬

৩৯. বিশ-একুশ প্রমা প্রকাশনী - ১৯৮৬

৪০. বৈসূচনের সেনা প্রমা প্রকাশনী - ১৯৮৭

৪১. বন্দোবস্থী করুনা প্রকাশনী - ১৯৮৮

৪২. টেরোড্যাকটিল, পুরান সহায় ও পিরথা প্রমা প্রকাশনী - ১৯৮৯

৪৩. সতী প্রমা প্রকাশনী - ১৯৮৯

৪৪. প্রথম পাঠ (একত্রে দুটি উপন্যাস, অমৃত ধারা - ১৯৮৯
ক. প্রথম পাঠ, খ. সন্ধ্যার পাঠশালা)

৪৫. ক্ষুধা দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯২

৪৬. মার্ডারারের মা দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯২

৪৭. হিরো: একটি ব্লু-প্রিন্ট দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৩

৪৮. আই. পি. সি. ৩৭৫ করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৩

৪৯. সাত নম্বর আত্মহত্যা বিকাশ গ্রন্থ ভবন - ১৯৯৪

৫০. আগুন জ্বলেছিল দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৪

৫১. ব্যাধখন্ড দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৪

৫২. কৈবর্তখন্ড দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৪

৫৩. সাংবাদিক বিকাশ গ্রন্থ ভবন - ১৯৯৪

৫৪. বেনেবউ করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৪

৫৫. প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৪

৫৬. ৬ই ডিসেম্বরের পর করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৪

৫৭. প্রস্থানপর্ব দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৫

৫৮. নীলুর জন্য করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৬

৫৯. ঘোড়ানো সিঁড়ি করুনা প্রকাশনী - ১৯৯৭

৬০. যে যুদ্ধ থামল না দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৮

৬১. ঊনত্রিশ নম্বর ধারার আসামী দে'জ পাবলিশিং - ১৯৯৮

৬২. জটায়ু বিকাশ গ্রন্থ ভবন - ২০০১

৬৩. দশটি উপন্যাস: করুনা প্রকাশনী - ২০০২

ক. গান্ধারী পর্ব,

খ. পোষ্ট মর্ডেম, গ. সাংবাদিক, ঘ. ঝাঁঝরি-কড়া-বেড়ি-হাতা,

ঙ. মনে মনে, চ. রেজিস্টার্ড নং ১০৩৭ ওয়ান্টেড, ছ. গোহ,

জ. বেদনা বালার আত্মকথা, ঝ. দুস্তর

৬৪. স্বপ্ন দেখার অধিকার (৫টি উপন্যাস মিত্র ও ঘোষ - ২০০৪

ক. স্বপ্ন দেখার অধিকার, খ. ধান কুড়ানি, গ. সম্পর্ক,

ঘ. একটি রাত কহানি, ঙ. এলাটিং বেলাটিং সই লো)

৬৫. দিয়া ও মেয়ে নামতা (দুইটি ছোট উপন্যাস) দে'জ পাবলিশিং - ২০০৪

ক. দিয়া, খ. মেয়ে নামতা

৬৬. তিন কন্যা ও অধবা (দুটি ছোট উপন্যাস) দে'জ পাবলিশিং - ২০০৯

ক. তিন কন্যা, খ. অধবা

৬৭. পাঁচটি উপন্যাস করুনা প্রকাশনী - ২০১০

ক. রূপ রাখা, খ. নিরুদ্দেশ যাত্রা, গ. মধুরে মধুর,

ঘ. দুর্ঘটনা, ঙ. মিলুর জন্য,

৬৮. নানা রসের ৯টি উপন্যাস দ্বীপ প্রকাশন - ২০০১১

ক. মিলুর জন্য, খ. প্রস্থান পর্ব, গ. অই.পি.সি ৩৭৫,

ঘ. প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে, ঙ. পারিবারিক, চ. মুখ,

ছ. কেয়ারটেকার, জ. ঘোরানো সিঁড়ি, ঝ. ন্যাদোশ,

পরিশিষ্ট: ছিন্ন পাতার ভেলা,

৬৯. অস্থির পঞ্চম (পাঁচটি উপন্যাস) পাল পাবলিশিং - ২০১১

ক. রাহুকাল, খ. মৃত্যু সংবাদ, গ. বিনীতা মিত্র,

ঘ. লক্ষ্মন রেখা, ঙ. অস্থির পঞ্চম,

পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস

১. আকাশছোঁয়া / উল্টোরথ। ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৮৮১ শকাব্দ/ ১৯৫৯ খ্রী.

২. স্বয়ংবরা/বসুধারা। ৪র্থ বর্ষ, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৮/ ১৯৬০, (রূপ রাখা উপন্যাসের আদিরূপ)

৩. ফানুস/ শারদ বসুধারা। ১৩৬৮/ ১৯৬১খ্রী.

৪. সামনে তাকাও/গল্পভারতী। কার্তিক১৩৬৮/১৯৬১খ্রী.

৫. শেষ অঙ্ক: /শেষ দৃশ্য/ সিনেমা জগৎ। আশ্বিন ১৮৬৮ শক/১৯৬৬ খ্রী.

৬. গোলাপের যুদ্ধ, শারদীয় গল্প ভারতী। ১৩৭২/১৯৬৫খ্রী.

৭. বাসস্টপে বর্ষা/ শারদীয় দীপান্বিতা। ১৩৭৩/ ১৯৬৬খ্রী.

৮. ক্ষুধা / উল্টোরথ। ১৫ বর্ষ, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৮৮৮ শক /১৯৬৬খ্রী.

৯. তিনটি জল ছবি/ সিনেমা জগৎ। বিশেষ সারদীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৮৮৮ শক/ ১৯৬৬খ্রী.

১০. জনমত, উল্টোরথ, বিশেষ জন্মদিন সংখ্যা, আষাঢ়, ১৮৮৯ শক/১৯৬৭ খ্রী.

১১. চন্ডালিকা, উল্টোরথ, নববর্ষ সংখ্যা, বৈশাখ ১৯৬৮খ্রী.

১২. বৈশাখি ঝড়/ উল্টোরথ, আষাঢ়, ১৯৬৯খ্রী.

১৩. মোমবাতি/ শারদীয়জলসা, ১৯৬৯খ্রী.

১৪. দেবিকার জন্মদিন/ উল্টোরথ, জন্মদিন সংখ্যা, ১৯৭২খ্রী.

১৫. জন্মযদিতব,(মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনভিত্তিক) / শারদীয় দক্ষিনী বার্তা, ১৯৭৬

১৬. মাস্টার সাব/ শারদীয় প্রমা, ১৯৭৯খ্রী.

১৭. হুলমাহা/ শারদীয় যুগান্তর। ১৯৮২খ্রী.

১৮. পিতা/ শারদীয় দৈনিক বসুমতী ১৯৮৫খ্রী.

১৯. বর্ণমালা/শারদীয় সত্যযুগ। ১৯৮৫ খ্রী.(সত্য অসত্য উপন্যাসের আদিরূপ)

২০. জঙ্গল/ঋতুপত্র গাঙ্গেয়। ১৯৮৬খ্রী.

২১. কুড়ানি/ কলকাতা শারদীয়, ১৯৮৯খ্রী.

২২. পোস্টমর্টেম / শারদীয় নবকল্লোল, ১৯৮৯খ্রী.

২৩. জনক / শারদীয় প্রসাদ। ১৯৮৯খ্রী.

২৪. মহাকাল/ শারদীয় দৈনিক বসুমতী। ১৯৯০খ্রী.

২৫. সময়, এই সময়/ শারদীয় ওভারল্যান্ড, ১৯৯০খ্রী.

২৬. গান্ধারী পর্ব/ শারদীয় প্রসাদ, ১৯৯১খ্রী.(দশটি উপন্যাস গ্রন্থে সংকলিত)

২৭. সংবাদ/ শারদীয় নবকল্লোল, ১৯৯২খ্রী. (দশটি উপন্যাস গ্রন্থে সংকলিত)

২৮. রাহুকাল / ওভারল্যান্ড, উৎসব সংখ্যা, ১৯৯২খ্রী. ('অস্থির পঞ্চম' গ্রন্থে সংকলিত)

৩০. লক্ষণরেখা/ শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ১৯৯৫খ্রী. ('অস্থির পঞ্চম' গ্রন্থে সংকলিত)

৩১. ম্রু / শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫খ্রী.

৩২. বিনীতা মিত্র/ শারদীয় নবকল্লোল, ১৯৯৫ ('অস্থির পঞ্চম' গ্রন্থে সংকলিত)

৩৩. অস্থির পঞ্চম/ প্রসাদ। পূজা, ১৯৯৫খ্রী. ('অস্থির পঞ্চম' গ্রন্থে সংকলিত)

৩৪. হাইরাইজ/শারদীয় মনোরমা, ১৯৯৬খ্রী.

৩৫. রেজিস্টার্ড নং ১০৩৪/ শারদীয় নবকল্লোল, ১৯৯৬ ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৩৬. রাতকহানী(প্রথম পর্ব), শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯৭খ্রী.

৩৭. বেদনাবালার আত্মকথা/ শারদীয় বর্তমান, ১৯৯৭খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৩৮. ধানকুড়ানি/ শারদীয় প্রসাদ, ১৯৯৮খ্রী. ('স্বপ্ন দেখার অধিকার' গ্রন্থে সংকলিত)

৩৯. মনে মনে/ শারদীয় প্রসাদ, ১৯৯৯খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৪০. একটি রাতকহানী/ শারদীয় আজকাল, ২০০০খ্রী. ('স্বপ্ন দেখার অধিকার' গ্রন্থে সংকলিত)

৪১. ঝাঁঝরি-করা-বেড়ি-হাতা/ শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ২০০০খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থেসংকলিত)

৪২. সম্পর্ক/ শারদীয় প্রসাদ, ২০০০খ্রী. ('স্বপ্ন দেখার অধিকার' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৩. ওয়ান্টেড / শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন। ২০০১খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৪. গোহ / শারদীয় আজকাল, ২০০১ খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৫. পোস্টমর্টেম / শারদীয় প্রসাদ, ২০০১খ্রী. ('দশটি উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৬. স্বপ্ন দেখার অধিকার / শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ২০০২খ্রী. ('স্বপ্ন দেখার অধিকার' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৭. এলাটিং বেলাটিং সই লো/ সারদীয় প্রসাদ, ২০০২খ্রী. ('স্বপ্ন দেখার অধিকার' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৮. দিয়া/ শারদীয় প্রসাদ, ২০০৩খ্রী. ('দিয়া ও মেয়ে নামতা' গ্রন্থে সংকলিত)

৪৯. মেয়ে নামতা/ শারদীয় সংখ্যা প্রতিদিন, ২০০৯, ('দিয়া ও মেয়ে নামতা' গ্রন্থে সংকলিত)

৫০. নৃসিংহ দুরবতার/ চতুস্পর্ণা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

গল্প-সংকলন

সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর রচিত ও 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি হল:

১. আমি ছবি আঁকিনে আকে আমার মন, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ০১. ০৩. ১৯৫২
২. কালবৈশাখি, শ্রীমতি সুমিত্রা দেবী,শ্রী সুমিত্রা দেবী, ২৬. ০৪. ১৯৫২
৩. বিস্মরণী, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ৩১. ০৫. ১৯৫২
৪. একটি আষাঢ়ে গল্প, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৩. ০৩. ১৯৫৪
৫. গরু একটি গৃহপালিত জন্তু, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ০৩. ০৪. ১৯৫৪
৬. শান্তিকুঞ্জ, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ০৫. ০৬. ১৯৫৪
৭. মাঝরাতের ইন্তেজার, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৭. ০৭. ১৯৫৪
৮. প্রতিশ্রুতি, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ৩০. ১০. ১৯৫৪
৯. মিঞা কি মোল্লার, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ২৫. ১২. ১৯৫৪
১০. ইন্দোরের লবঙ্গলতিকা রায়, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১২. ০২. ১৯৫৪
১১. অনবরত বাগচীর হিমালয় যাত্রা, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ২৬. ০২. ১৯৫৫
১২. অনবরত বাগচীর দ্বিপান্তরিতা, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ০৫. ০৩. ১৯৫৫
১৩. কারণ ছিল, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৯. ০৩. ১৯৫৫
১৪. পূর্বাভাস, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ২৩. ০৪. ১৯৫৫
১৫. মালতিরা কোথায় যায়, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ৩০. ০৪. ১৯৫৫
১৬. পুতুল দিদি, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৪. ০৪. ১৯৫৫
১৭. ত্রিভুজ, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ০৯. ০৭. ১৯৫৫
১৮. একমাত্র আত্মীয়, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৬. ০৭. ১৯৫৫
১৯. মদনের বিয়োগ কাহিনি, শ্রী সুমিত্রা দেবী, ১৪. ০১. ১৯৫৬

গল্পগ্রন্থ

১. কি বসন্তে কি শরতে (প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন বুক সোসাইটি১৯৫৯
৯ টি গল্প) ১. যশবন্তী, ২. সতীরানির ঘাট, ৩. পদ্মিনী,
৪. শুধু পটে লিখা, ৫. জলে ঢেউ দিও না, ৬. চম্পা,
৭. পরম আত্মীয়, ৮. চিন্তা, ৯. ছায়াছবি,

২. সপ্তপর্ণী (৭টি গল্প) বিশ্ববাণী ১৯৬০
১. তৃষ্ণা, ২. সোনালী মাছ, ৩. দাহ, ৪. বেড়াল,
৫. ছেঁড়া চিঠি, ৬. রঙ্গওয়ালী, ৭. আশু ডাক্তারের বাড়ি,

৩. সোনা নয় রূপো নয় (দুইটি গল্প) আর.এন.চ্যাটার্জি ১৯৬২
১. সোনা নয় রূপো নয়, ২. শৈবাললতা

৪. সুভগা বসন্ত (২টি গল্প) অমর সাহিত্য প্রকাশন ১৯৬৮
১. দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি,
২. রোমথা,

৫. অনবরত'র অবিশ্বাস্য (১১টি গল্প) মন্ডল বুক হাউস ১৯৭২
গল্পগুলির পৃথক নাম নেই, একই প্রকাশন সংস্থা থেকে
'অবিশ্বাস্য' নামে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৯৯ খ্রী.

৬. অগ্নিগর্ভ (৪টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৭৮
১. অপারেশন বসাই টুডু, ২. দ্রৌপদী, ৩. জল,
৪. এম.ডব্লু. বনাম লখিন্দ

৭. বেহুলা (৫টি গল্প) অন্যধারা প্রকাশনী ১৯৭৯

১. গুরু, ২. জাতুধান, ৩. অস্থি, ৪. জল, ৫. বেহুলা,

৮. মূর্তি (২টি গল্প) নব পত্র প্রকাশনী ১৯৭৯

১. মূর্তি, ২. মোহনপুরের রূপকথা,

৯. নৈর্ঋতে মেঘ (৮টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৭৯

১. জগমোহনের মৃত্যু, ২. শিকার, ৩. শিশু, ৪. নুন, ৫. বিছন,
৬. ধৌলি, ৭. রুদালী, ৮. ডাইনি,

১০. স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প (১৭টি গল্প)

১. জগন্নাধের রথ, ২. যশোমতি, ৩. বান, ৪. সন্দেশ,
৫. বাঁয়েন, ৬. সাঁঝ সকালের মা, ৭. ভীস্মের পিপাসা,
৮. বিশালাক্ষির ঘর, ৯. হারূন সালেমের মাসি, ১০. নেশা
১১. যমুনাবতীর মা, ১২. আজীর, ১৩. মাদার ইন্ডিয়া, ১৪.
এইচ.এফ.৩৭:রিপৌর্টাস, ১৫. নিহত ও মৃত, ১৬. স্তনদায়িনী,
১৭. অনন্ত খাটুয়া : এইচ. এম.

১১. হরিরাম মাহাতো (২টি গল্প) প্রকাশক প্রকাশন সংস্থা ১৯৮২

১. হরিরাম মাহাতো, ২. সাগোয়ানা

১২. ইটের পরে ইট (৪টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৮২

১. এজাহার, ২. শনিচরী, ৩. রাজাবাসার রূপকথা
৪. ইটের পরে ইট

১৩. মায়ের মূর্তি (৮টি গল্প) সমকাল প্রকাশনী ১৯৮২

১. মায়ের মূর্তি, ২. জাহ্নবী মা, ৩. সাঁঝ সকালের মা,
৪. যমুনাবতীর মা, ৫. মাদার ইন্ডিয়া, ৬. মাদার ইন্ডিয়া,
৭. বান, ৮. কানাই বৈরাগীর মা,

১৪. শাল গিরার ডাকে (৩টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৮২
১. শালগিরার ডাকে, ২. প্রেতোৎসব,
৩. হুলমাহার মা,

১৫. পাঁকাল (২টি গল্প) প্রকাশক প্রকাশন সংস্থা ১৯৮৩
১. চরণদাসী, ২. পাঁকাল,

১৬. গ্রাম বাংলা (৩টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৮৪
১. গ্রাম বাংলা, ২. সীমান্ত, ৩. অন্ধকারের সন্ততি,

১৭. গ্রাম বাংলা (৪টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৮৪
১. রাজা, ২. স্বদেশের ধূলি, ৩. লাইফার,
৪. তেপান্তরী,

১৮. মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠগল্প (১৫টি গল্প) প্রমা ১৯৮৪
১. চম্পা, ২. পরম আপ্তীয়, ৩. চিন্তা, ৪. ছায়াবাজি,
৫. সোনালী মাছ, ৬. দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি,
৭. শরীর, ৮. ধীবর, ৯. পিণ্ডদান, ১০. জল, ১১. রংনাম্বার,
১২. উর্বশী ও জনি, ১৩. বাঁয়েন, ১৪. আজীর, ১৫. স্তনদায়িনী,

১৯. দৌলতি (৩টি গল্প) নবপত্র প্রকাশন ১৯৮৫
১. দৌলতি, ২. পালামৌ, ৩. গোহুমণি

২০. আশ্রয় ও সত্য-অসত্য (২টি গল্প) মন্ডল বুক হাউস ১৯৮৫

১. আশ্রয়, ২. সত্য-অসত্য

২১. সিধু কানুর ডাকে (২টি গল্প) শরৎ পাবলিশিং ১৯৮৫

প্রথমটি শিরোনাম হীন, দ্বিতীয়টির শিরোনাম ঘন্টাবাজে,

২২. নির্বাচিত সংকলন/ মহাশ্বেতা দেবী শরৎ পাবলিশিং ১৯৮৬

বর্তিকা মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা,১৯৮৫তে সংকলিত ১৭টি গল্প, পৃথক গ্রন্থাকারে এই নামে প্রকাশিত, ১. জল, ২. তরাস, ৩. ভাতুয়া, ৪. পিতাপুত্র, ৫. এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাস, ৬. সমাজবাদ ববুয়া, ৭. চড়ক, ৮. ভীষণ যুদ্ধের পর, ৯. জাতুধান, ১০. গিরিবালা, ১১. ভাত, ১২. চড়ক, ১৩. বড়াম মায়ের থান, ১৪. ভাসাভাসি ১৫. মানত, ১৬. কুড়োনির বেটা, ১৭. অর্জুন,

২৩. ঘাতক (২টি গল্প) নির্মল বুক এজেন্সি ১৯৮৭

১. ঘাতক, ২. মুখ

২৪. পারিবারিক (৩টি গল্প) শশধর প্রকাশনী ১৯৮৯

১. পিতা, ২. পুত্র, ৩. স্ত্রী,

২৫. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প (৮টি গল্প) প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস ১৯৯০

১. কালিদাসের হেঁয়ালি, ২. ডবল, ৩. সংরক্ষণ, ৪. ভারতবর্ষ, ৫. রাম রহিমের কথা, ৬. ভূমিদাত্রি, ৭. স্বদেশের ধূলি, ৮. মৃত্যুর কারণ,

২৬. অজ্ঞাত পরিচয়, (২টি গল্প) অনন্য প্রকাশন ১৯৯১

১. অজ্ঞাত পরিচয়, ২. সমাজবিরোধীর মা,

২৭. সাম্প্রতিক (২টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৯১

১. নিরুদ্দেশ যাত্রা, ২. দুর্ঘটনা

২৮. তালাক ও অন্যান্য গল্প(১৭টি গল্প) মিত্র ও ঘোষ ১৯৯১

১. তালাক, ২. আশ্রয়, ৩. কাগা বগা গীতিকা, ৪. পরবাসী, ৫. পথিকৃত, ৬. ভালবাসা, ৭. কবিপত্নী, ৮. ময়না রায়, ৯. জন্মতিথি, ১০. দ্রব্যমূল্য, ১১. হেলেন মাসির কাকা, ১২. বিশালাক্ষির ঘর, ১৩. জন্মদিন, ১৪. রাক্ষস, ১৫. ভাত, ১৬. নিজের জন্য, ১৭. তীর্থশেষের সন্ধ্যা,

২৯. রুদালী (৩টি গল্প) দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৩

১. রূদালী, ২. টুংকুর, ৩. গোহুমনি

৩০. স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প (১৩টি গল্প) প্রমা ১৯৯৩

১. চিন্তা, ২. দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি ৩. জল, ৪. উর্বশী ও জনি, ৫. স্তনদায়িনী, ৬. বিছন, ৭. আজীর, ৮. বাঁয়েন, ৯. শিশু, ১০. এজাহার, ১১. নুন, ১২. সংরক্ষন, ১৩. ভারতবর্ষ,

৩১. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন (৯টি গল্প) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৯৩

১. বান, ২. বিছন, ৩. দ্রৌপদী, ৪. রংনাম্বার, ৫. শিকার ৬. সাঁঝ সকালের মা, ৭. বাঁয়েন, ৮. বেহুলা, ৯. মৌল অধিকার,

৩২. মুখ (২টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৯৩

১. মুখ, ২. কেয়ার টেকার

৩৩. কৃষ্ণাদ্বাদশী (৩টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৯৩

১. কৃষ্ণাদ্বাদশী, ২. যৌবন, ৩. শুধু কিংবদন্তি

৩৪. শিকার পর্ব (৪টি গল্প) মিত্র ও ঘোষ ১৯৯৪

১. শিকার পর্ব, ২. মহাপুরূষ, ৩. দুটি আইনের আসামী

৪. পেনশনার,

৩৫. মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস ১৯৯৬

১. দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুর বটের কাহিনি, ২. রোমথা,
৩. তালাক, ৪. বান, ৫. সাঁঝ সকালের মা, ৬. ভীস্মের পিপাসা,
৭. সিন্ধুবালা, ৮. জলসত্র, ৯. জগন্নাথের রথ, ১০. এইচ. এফ. ৩৭ :
রিপোর্টাস, ১১. উর্বশী ও জনি, ১২. স্তনদায়িনী, ১৩. বিছন, ১৪. বাঁয়েন,
১৫. নিশাত মাঝির ভূটান যাত্রা, ১৬. বেহুলা, ১৭. জগমোহনের মৃত্যু,
১৮. শূন্যস্থান পূর্ণ কর, ১৯. জাহ্নবী মা, ২০. মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ,
২১. রুদালী, ২২. শিশু, ২৩. নুন, ২৪. গিরিবালা, ২৫. কুড়োনির বেটা,
২৬. ভাত, ২৭. মোহন পুরের রূপকথা, ২৮. গতিগঙ্গা যুগিদাস নাইয়া,
২৯. গনপতি কোটাল, ৩০. গন্ধ, ৩১. ছুরি, ৩২. কবিপত্নি, ৩৩. কাগাবগা গীতিকা,
৩৪. গান্ধী ময়দান ও রঘুয়া দুসাদ, ৩৫. তেতরি কহানি, ৩৬. জন্মদিন,
৩৭. ভিত্তি, ৩৮. মৃত্যুর কারণ, ৩৯. অর্জুন, ৪০. ভারতবর্ষ, ৪১. অন্ন অরন্য. . .
৪২. গঙ্গার স্বর্গ, ৪৩. রাখদার, ৪৪. লাইফার, ৪৫. জান্নবির মুক্তি,
৪৬. ময়না সতি/একটি অলৌকিক কাহিনি, ৪৭. পঞ্চাশতম বছরে বদনী,
৪৮. চিরাচরিত, ৪৯. তীর : ১৯৯৩ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ, ৫০. চোলি কা পিছে,

৩৬. নির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প (২৩টি গল্প) মডেল পাবলিশিং হাউস ১৯৯৭

১. পরম আপ্তীয়, ২. ছায়াবাজি, ৩. যশবন্তী, ৪. ম্যাডোনা,
৫. আত্মজা, ৬. তালাক, ৭. ভাত, ৮. মৌল অধিকার ও ভিখাড়ি দুসাদ,
৯. মাছ, ১০. তেতরি কহানী, ১১. কালিদাসের হেঁয়ালি, ১২. রাবণ,
১৩. ডবল. ১৪. রাবণ বধ, ১৫. মানত, ১৬. নিজের জন্য, ১৭. লাইফার,
১৮. চোলিকা পিছে, ১৯. ১৯৯৩: আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ,
২০. রূপসি মান্না, ২১. ১০+১০, ২২. সন্ধাভাষা, ২৩. বলেছিল পানি,

৩৭. বাছাই গল্প (১৮টি গল্প) মন্ডল বুক হাউস ১৯৯৯
১. স্তনদায়িনী, ২. জগমোহনের মৃত্যু, ৩. শূন্যস্থান পূর্ণ কর,
৪. জাতুধান, ৫. বেহুলা, ৬. হুলমাহার মা, ৭. ধৌলী,
৮. হীরামোতি, ৯. কালিদাসের হেঁয়ালি, ১০. ডবল,
১১. রাম রহিমের কথা, ১২. নববর্ষ, ১৩. কুসুমা,
১৪. সংরক্ষণ, ১৫. ময়নাসতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনি,
১৬. ভারতবর্ষ, ১৭. দৌড়, ১৮. পোলিটিস,

৩৮. যাবজ্জীবন (৩টি গল্প) করুনা প্রকাশনী ১৯৯৯
১. চলে যায়, ২. ফিরল না, ৩. ফিরে আসে,

৩৯. নিরানব্বুই এর গল্প (৩টি গল্প) থীমা ২০০০
১. শেষ সামানিন, ২. কুন্তি ও নিষাদী,
৩. ঝুক্কু ঝুক্কু ঝুক ঝুক আ গিলা গাড়ি,

৪০. নির্বাচিত সেরা বারো বিকাশ গ্রন্থ ভবন ২০০১
১. দ্রৌপদী, ২. পোলিটিস, ৩. দৌড়, ৪. কুসুমা,
৫. হীরামোতি, ৬. তেতরি কহানি, ৭. রাবণ বধ,
৮. লাইফার, ৯. সন্ধাভাষা, ১০শিকার,
১১. হুলমাহার মা, ১২. বাঁয়েন,

৪১. শ্রেষ্ঠ গল্প (২২টি গল্প) দে'জ পাবলিশিং ২০০৪

১. যশবন্তী, ২. বান, ৩. বাঁয়েন, ৪. পিণ্ডদান, ৫. তালাক,
৬. মাদার ইন্ডিয়া, ৭. দ্রৌপদী, ৮. এইচ. এফ. ৩৭: রিপোর্টাস,
৯. স্তনদায়িনী, ১০. শিশু, ১১. নুন, ১২. ঘর, ১৩. মৌল অধিকার,
১৪. ফারকাটি, ১৫. বিছন, ১৬. জল, ১৭. রং নাম্বার,
১৮. হুলমাহার মা, ১৯. ভাত, ২০. লাইফার, ২১. গতিগঙ্গা যুগিদাস নাইয়া,
২২. তেতরি কহানি, ২৩. সংরক্ষণ, ২৪. চোলিকা পিছে, ২৫. শেষ সামানিন,
২৬. মাহাদু : একটি রূপ কথা, ২৭. শেষ ঝোকতা

৪২. মহাশ্বেতা দেবীর প্রেমের গল্প (১৯টি গল্প) বানী শিল্প(২০০৪)

১. অনবরত বাগচী এবং দীপান্বিতা, ২. রঙ্গওয়ালী, ৩. অনসূয়া,
৪. যশবন্তী, ৫. জলে ঢেউ দিওনা, ৬. আশ্রয়, ৭. ভালোবাসা,
৮. বান, ৯. তালাক, ১০. কবিপত্নী, ১১. কাগাবগা গীতিকা,
১২. রাজাবাসার রূপকথা, ১৩. শিকার, ১৪. উর্বশী ও জনি,
১৫. ঝুক্কু ঝুক্কু ঝুক ঝুক আ গিলা গাড়ি, ১৬. লাইফার,
১৭. জলসত্র, ১৮. জগন্নাথের রথ, ১৯. নিজের জন্য,

৪৩. জরৎকুমারী ও অন্যান্য গল্প (১৪টি গল্প) দে'জ পাবলিশিং (২০০৬)

১. মকর শবর, ২. ফলক ভাঙার গল্প, ৩. পন্য, ৪. ত্রিবৃন্তকা,
৫. উলি বুলির মায়ের জেবনবেত্তান্ত, ৬. জরৎকুমারী,
৭. পঞ্চকন্যা, ৮. নাম নেই ঠিকানা নেই, ৯. নলিনীর উপাখ্যান,
১০. শিব ঠাকুরের বিবে, ১১. সৌবলী, ১২. হাপ্-মাস, ১৩. নাম নেই,
১৪. ভেংকটাসনী ও নারীয়োঁ,

৪৪. জগমোহনের মৃত্যু ও আরও গল্প (৫টি গল্প) লালমাটি(২০০৭)

১. পর্বত, ২. নুন, ৩. নিশাত মাঝির ভূটান যাত্রা, ৪. গজমোহনের মৃত্যু,

৫. সংরক্ষণ,

৪৫. বেহুলার বারমাস্যা (১০টি গল্প) মিত্র ও ঘোষ (২০০৭)

১. জগন্নাথের রথ, ২. ভাত, ৩. এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ,
৪. বেহুলা, ৫. গঙ্গার স্বর্গ, ৬. জাহ্নবীর মুক্তি, ৭. ময়না সতী অথবা. . .
৮. জরৎকুমারী, ৯. শিব ঠাকুরের বিয়ে, ১০. হাপ্-মাস,

৪৬. মেয়ের নাম ফেলি (৫টি গল্প) দে'জ পাবলিশিং(২০০৯)

১. লালগড়ের মা, ২. কলাবৌ, ৩. নেয় না, ৪. মেয়ের নাম ফেলি,
৫. ছয় নম্বর জ্যাঠা

৪৭. মহাশ্বেতা দেবীর পচাত্তরটি গল্প করুনা প্রকাশনী (২০১১)

১. যশোমতি, ২. তালাক, ৩. শরীর, ৪. শিকার, ৫. জগন্নাথের মন্দির,
৫. জগন্নাথের রথ, ৬. সিন্ধুবালা, ৭. মলিনা সোমের দিন ও রাত,
৮. শিশু, ৯. বান, ১০. জলসত্র, ১১. ধীবর, ১২. নুন, ১৩. সন্দেশ,
১৪. উর্বশী ও জনি, ১৫. বিগুলাল, ১৬. বিছন, ১৭. বাঁয়েন,
১৮. নিশাত মাঝির ভূটান যাত্রা, ১৯. তারপর, ২০. ধৌলী,
২১. সাঁঝ সকালের মা, ২২. চোর, ২৩. বেহুলা, ২৪. ভীস্মের পিপাসা,
২৫. গিরিবালা, ২৬. বিশালাক্ষীর ঘর, ২৭. পরম আপ্তীয়, ২৮. কুড়োনির বেটা,
২৯. হারুন সালেমের মাসি, ৩০. চিন্তা, ৩১. ভাত, ৩২. নেশা, ৩৩. ছায়াবাজি,
৩৪. গনপতি কোটাল, ৩৫. যমুনাবতীর মা, ৩৬. পর্বত, ৩৭. গন্ধ, ৩৮. আজীর,
৩৯. জোসনা রাতের ছেলে, ৪০. ছুরি, ৪১. মাদার ইন্ডিয়া, ৪২. উনপঞ্চাশ নম্বর খুন,
৪৩. ডাইনী, ৪৪. কবিপত্নী, ৪৫. এইচ. এফ. ৩৭:রিপোর্টাস, ৪৬. প্রমান ছিল না,
৪৭. কাগাবগা গীতিকা, ৪৮. নিহত ও মৃত, ৪৯. সমান্তরাল, ৫০. গান্ধী ময়দান ও রঘুয়া দুসাদ,৫১. পায়রা, ৫২. ভিত্তি, ৫৩. স্তনদায়িনী, ৫৪. চড়ক, ৫৫. তেতরি কহানি, ৫৬. কানু, ৫৭. মৃত্যুর কারণ, ৫৮. অনন্ত খাটুয়া: এইচ. এম, ৫৯. সাপ, ৬০. অর্জুন, ৬১. রং নাম্বার,৬২. ভারতবর্ষ, ৬৩. অগস্তি সাহেবের কুঠি,

৬৪. অন্ন অরন্য..., ৬৫. চক্র-ব্যুহ, ৬৬. লাইফার, ৬৭. পিন্ডদান, ৬৮. পঞ্চাশতম বছরে বদনী, ৬৯. বাঘের থাবা, ৭০. ভয়, ৭১. নৈতিক, ৭২. সুকু দুখুর ঊনআশি, ৭৩. মাছ, ৭৪. চক্ষুদান, ৭৫. দুরদর্শন,

কিশোর সাহিত্য

১. পথ চলি আনন্দে	পুস্তক প্রকাশক (১৯৫৯)
২. নেই নগরের নেই রাজা	শ্রী প্রকাশ ভবন (১৯৭৫)
৩. গঙ্গা থেকে সাগর	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (১৯৭০)
৪. এক কড়ির সাধ	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া (১৯৭৯)
৫. পাথরেরসিংহ	নন্দিতা পাবলিশার্স (১৯৭৯)
৬. শিশু মেলায় কালো মানিক	শিশু পাঠ ভবন (১৯৭৯)
৭. বিরসা মুন্ডা	কথাশিল্প (১৯৮১)
৮. গল্পের গোরু ন্যাদোশ (১২টি গল্প)	অঙ্কুর প্রকাশনী (১৯৮২)

১. গল্পের গোরু ন্যাদোশ, ২. ভাইয়াসাহেব, ৩. হরি-হর সভা,
৪. সবসময়ের গল্প, ৫. ভূতানন্দ কলোনি, ৬. বুনো কালী,
৭. ঝারোয়ার জঙ্গলে, ৮. জ্যান্ত কালী, ৯. বাঘা শিকারী,
১০. ভূতুরে ছবি, ১১. ভীষণ যুদ্ধের পর, ১২. সনা,

৯. রাজা	পক্ষিরাজ প্রকাশনী(১৯৮৪)
১০. হা, রে, রে, রে (৮টি গল্প)	নিউ বেঙ্গল প্রেস (১৯৮৪)

১. মহাশুরের নাতি, ২. পিসি ডাকাত, ৩. আপনি মোড়ল,
৪. চিতে ডাকাত, ৫. সাধু শিয়াল, ৬. ডাকাতে কালী,
৭. জটার কীর্তি, ৮. জ্যান্তকালী,

১১. বাঘা শিকারী (২০টি গল্প) শরৎ পাবলিশিং হাউস(১৯৮৬)
১. ঝারোয়ার জঙ্গলে, ২. বাঘা শিকারী, ৩. চালাক কুমোর বোকা রাজা,
৪. চারভাই, ৫. রথ, ৬. আষাঢ়ে, ৭. ভয়ংকর দূর্গা পূজা, ৮. লছমনের মা,
৯. এক কড়ির সাধ, ১০. ভারেঙ্গার ভূত, ১১. বীরে ডাকাত ছিড়ে ডাকাত,
১২. সেই ছেলেটা, ১৩. বুদ্ধিমান টিকটিকি, ১৪. ঝোড়ো সাধু, ১৫. রাত ভুতুরে,
১৬. তীরের রাজা, ১৭. ভুলোভূত, ১৮. ছোট্টনাকক, ১৯. শেয়াল কাটায় ফুল,
২০. খুদে ডাকাত,

১২. শ্রেষ্ঠ কিশোর সংকলন (১২টি গল্প) নন্দিতা পাবলিশার্স(১৯৮৬)
১. কানা পন্ডিত আর পান্ডা সাহেব, ২. ভুলোভূত, ৩. দুখী কোটাল,
৪. একানোড়ের দুঃখ, ৫. কষ্ট, ৬. শিয়ালদ টু বাজবাগান,
৭. ভালোছেলে, ৮. সেই ছেলেটা, ৯. ফল্গু আর চিতানুজ,
১০. অথ অজগর কথা, ১১. বাঘের চেয়েও ভয়ানক,
১২. পটলের পরোপকার,

১৩. মুনেশ্বর (৬টি গল্প) নির্মল বুক এজেন্সি(১৯৮৬)
১. মুনেশ্বর, ২. বুদ্ধিমান টিকটিকি, ৩. ছোট্ট পুরুত বলজিত,
৪. সাতভূতুরে, ৫. ঝোড়ো সাধু, ৬. ধাঁধাঁ,

১৪. কিশোর সঞ্চয় (১৩টি গল্প) ডেল্টা ফার্মা (১৯৮৯)
১. মধু ডাকাতের বন্ধু, ২. বড়াম মায়ের থানে, ৩. কল্পতরু,
৪. রমকের কান্ড, ৫. দাদুতাড়ুয়া, ৬. গোপাল বড়ো হল,
৭. ঝড় বাদলে ঘোড়া ভূত, ৮. উল্টোরথের দিন,

৯. কানা পন্ডিত আর পাতা সাহেব, ১০. বুড়ি মায়ের মোরগ ছেলে,
১২. পাথরের সিংহ, ১৩. ভীষণ যুদ্ধের পর,

১৫. এতোয়া মুন্ডার যুদ্ধজয় — ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯১)

১৬. সত্যি রাজার গল্প (২টি গল্প) — ভস্তক (১৯৯২)
১. রাজা, ২. নেই নগড়ের সেই রাজা,

১৭. আরমানী চাঁপার গল্প — পুনশ্চ(১৯৯২)

১৮. ছোটদের গল্প সম্ভার (১১টি গল্প) — ভস্তক(১৯৯৩)
১. গল্পের গরু ন্যাদোশ, ২. হরি-হর সভা, ৩. সব সময়ের গল্প,
৪. ভূতানন্দ কলোনি, ৫. বুনোকলোনী, ৬. ঝাড়োয়ার জঙ্গলে,
৭. জ্যান্তকালী, ৮. বাঘা শিকারী, ৯. ভীষণ যুদ্ধের পর, ১০. সোনা,
১১. মানিক দুলালের বন্ধু,

১৯. তুতুল — স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী(১৯৯৪)

২০. স্বনির্বাচিত কিশোর সমগ্র (২০টি গল্প) — পুনশ্চ (১৯৯৫)
১. মানিক দুলালের বন্ধু, ২. ঘন্টা বাবা, ৩. জাদু পাথর,
৪. নয়ন চাঁদের স্বপ্ন দেখা, ৫. একলা, ৬. একলা এবং ইমন,
৭. দাদুতাড়ুয়া, ৮. ভালোছেলে, ৯. অবাক ছেলের কথা,
১০. একটি ছেলের গল্প, ১১. লোকটা, ১২. ঝাড়োয়ার জঙ্গলে,
১৩. কোথাও, ১৪. ধাঁধাঁ, ১৫. অথ অজগর কথা, ১৬. বড়াম মায়ের থানে,
১৭. বুড়ি মায়ের মোড়গ ছেলে, ১৮. সাত ভূতুড়ে, ১৯. বীরাঙ্গনা,
২০. কিষণ করির কাহিনি,

২১. এতোয়া মুন্ডার লড়াই(এতোয়া মুন্ডার যুদ্ধ জয়ের সারসংক্ষেপ) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯৫)

২২. ডাকাতে কাহিনি (৮টি গল্প) থীমা(১৯৯৮)
১. বীরে ডাকাত ছিরে ডাকাত, ২. পিসি ডাকাত, ৩. চিতে ডাকাত,
৪. সাধু সিয়াল, ৫. ডাকাতে কালী, ৬. মধু ডাকাতের বন্ধু,
৭. খুদে ডাকাত, ৮. ঘন্টা বাবা,

২৩. আমাদের শান্তি নিকেতন সৃষ্টি প্রকাশন(২০০১)

২৪. আবার ন্যাদোশ(৪টি গল্প) গন্ধর্ব পাবলিশার্স(২০০৪)
১. আবার ন্যাদোশ, ২. পূজো মানেই ন্যাদোশ,
৩. ন্যদোশের হেরিটেজ সমস্যা, ৪. ন্যাদোশ,

২৫. রাজপুরীর রহস্য সোহিনী প্রকাশনী

২৬. রাজা থীমা(২০০৮)

২৭. কিশোর সাহিত্য শিশু সাহিত্য সংসদ(২০১১)

নাটক

১. হাজার চুরাশির মা ও অন্যান্য নাটক করুনা প্রকাশনী(১৯৯৯)
[হাজার চুরাশির মা, জল, উর্বসী ও জনি, বাঁয়েন, আজীর প্রভৃতি গল্প একত্রে ফাইভ

প্লেইস নামে অনুদিত হয়।]

প্রবন্ধ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য অ্যাকাডেমি(১৯৭৫)

২. ভারত মেঁ বন্ধুয়া মজদুর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(১৯৮১)

[সহ লেখক: নির্মল ঘোষ। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিক 'বর্তিকা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা ১৯৮১-৮২তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'ভারতে ভূমিদাসপ্রথা' শীর্ষক রচনার হিন্দি অনুবাদ। অনুবাদক আনন্দ স্বরূপ বর্মা, গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি।]

৩. লু-শুন : সমাজ ও সাহিত্য স্টান্ডার্ড পাবলিশার্শ (১৯৮২)

৪. অপ্রিয় কিছু সত্যের জন্য স্বতন্ত্র প্রকাশনী (১৯৯৫)

[সহ লেখক আজিজুল হক। এই গ্রন্থে 'জীবন যেরকম' বিভাগের অন্তর্গত ১৫টি রচনা মহাশ্বেতা দেবীর। রচনা গুলি হল, ১. লেখক মেয়েদের প্রতি একটু সদয় নজর দিন, ২. যে মাটিতে নারীর চোখের জল পড়ে, সে মাটি বন্ধ্যা হয়ে যায়, ৩. নিষিদ্ধ পল্লির মেয়েরা, ৪. বিবাহ পরমাগতি, ৫. বিসর্জনের বাজনা, ৬. আমরা আত্মকেন্দ্রিক রোবট, ৭. বর্ণবৈষম্য পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমান, ৮. পিছনদিকে তাকান, ৯. মানুষ নিয়ে ব্যবসা, ১০. দারিদ্র একটা বিশাল ক্যাপিটাল, ১১. কলকাতা শুধুই বড়লোকদের শহর নয়, ১২. প্রতিবাদ করুন, ১৩. খেলতে খেলতে আমরা বল হয়ে গেলাম, ১৪. যাদের জন্য ছবি-তাদের দেখায় কে, ১৫. প্রতিবাদ ভূলেছে প্রতিবাদের শহর।]

৫. ঋত্বিক ঘটক, আরে সে এক মহা ইয়ে আজকাল পাবলিশার্স(১৯৯৮)

[সহ লেখক : তুষার তালুকদার। গ্রন্থের প্রথম দুটি রচনা মহাশ্বেতা দেবীর, ১. স্মৃতিতে শূন্যতা বোধ, ২. হিসেবের বাইরে,]

৬. অরন্য-সন্তান শবর খেড়িয়া ক্যাম্প(১৯৯৮)

[সহ লেখক: জলধর শবর, গোপীবল্লভ লাল সিংদেও,, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত রক্ষিত, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক, গ্রন্থের প্রথম দশটি রচনা এবং একটি সাক্ষাৎকার মহাশ্বেতা দেবীর। রচনা: ১. শবর তীর্থ, ২. খেড়িয়া শবররা এগোচ্ছে, ৩. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপে, ৪. ৫০ বছরের স্বাধীনতা ও লোধা, ৫. মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী সমীপে, ৬. মাধ্যমিক পাশ লোধাছেলের মা বললেন, ৭. বাবু। তোমরা ছানা গুলোকে পড়াতে সাহায্য কর, ৮. চাই অথবা নেই, ৯. চাই প্রতিরোধ চাই বিনাশ, ১০. এই মৃত্যু উপত্যকাই আমার দেশ। সাক্যাৎকার: 'খেড়িয়া সবর সমিতিই আমার জীবনের শেষ বাসস্টপ।' পবিত্র সরকার গৃহীত,]

৭. খন্ডিত দর্পনে সমাজ চিত্র ক্যাম্প(১৯৯৯)

[পত্রিকায় প্রকাশিত সাময়িক প্রসঙ্গের নির্বাচিত সঙ্কলন, সূচি: ১. মেয়ের নাম ফেলি ও অন্যান্য (২৯টি রচনা)। ২. স্বাস্থ্যচিত্র- নৈরাজ্যের স্বরাজ (১০টি রচনা), ৩. শিক্ষা ও সমাজ (৯টি রচনা), ৪. শিশু শৈশব এবং ভারতবর্ষ (৩টি রচনা)

৮. গুজরাট দিচ্ছে ডাক আজকাল(২০০২)

[৩৪টি রচনার সংকলন, তার মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর ১০টি, ১. গুজরাট রাট্রপতিকে চিঠি,২. না বলুন, ৩. কেন ধর্মের নামে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ? ৪. গনরোষের স্বতঃস্ফুর্ত অভিব্যক্তি,৫. তবু জাগে মানবতা, ৬. লজ্জা ও কলঙ্কের ইস্তেহার, ৭. কর্ণাবতী শহরে, ৮. রাম মন্দির নির্মানার্থে নির্বাচিত বলি, ৯. কোথায় শেষ, ১০. মুষল পর্ব চলছেই।

৯. অন্য লেখা আজকাল (২০০৩)

[বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ৩৭টি রচনার সংকলন: ১. পাঠকের কথা, ২. তাহার লেখা, ৩. চেতনায় দুই বিশ্ব, ৪. দীপেন, ৫. দুটি মৃত্যু, ৬. অজানা ভারত, ৭. লু-শুন, ৮. অপু দূর্গার সেই দেশে, ৯. দূর্গারা তেমনি করে আজও মরে, ১০. তাঁর একক লড়াই ইংরেজির সঙ্গে, ১১. স্টেটাস ভাইরাস, ১২. মূল্যবান বই দুস্প্রাপ্য হয়ে

উঠছে, ১৩. বইয়ের মতো বন্ধু আর কে আছে, ১৪. পয়লা বৈশাখ, ১৫. কাকদ্বীপ আন্দোলনের বিস্মৃত নায়ক, ১৬. বই, ১৭. কেতাবের ফৌজ, ১৮. অনেক দরজা, ১৯. লেখক ও প্রকাশক, ২০. লেখা লেখি নিয়ে, ২১. সময়ের খরস্রোত, ২২. কলকাতায় প্রথম এবং বারবার, ২৩. নিজের লেখা, ২৪. অক্লান্ত চারনিক, ২৫. মূল ভূমিকা সাধনা ও পরিশ্রমের, ২৬. সমর সেন, ২৭. ক্ষনিকের দেখা ভাললাগা মানুষ, ২৮. ছিলেন দুঃখজয়ী, সৎধর্মের মানুষ, ২৯. শৈলজা, ৩০. সাহিত্য পাঠ, ৩১. আমি মৃত্যুকে মানি না, ৩২. মহীয়সী, ৩৩. স্বজোন মহর, ৩৪. একেকটা দিন, ৩৫. ঊননব্বই বছরেও তরুণ ছিলেন, ৩৬. খোলা চিঠি: উমাপদ মজুমদারকে, ৩৭. শ্যামল,

অনুবাদ

১. বাপু	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (১৯৬৭)
২. নদীর কথা	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৬৮)
৩. কাশ্মীর	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (১৯৭০)
৪. ছায়া ছবি	ব্লু-বেল(১৯৭৩)
৫. সাভোর মানুষ খেকো	ব্লু-বেল(১৯৭৬)
৬. গান্ধী মানস	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯৪)
৭. হিন্দু ধর্ম কি	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯৬)
৮. ভারতের লোককথা	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯৮)
৯. বহ্নিমানজীবন	দে'জ পাবলিশিং(২০১১)

সম্পাদনা

১. জিম করবেট অমনিবাস (২য় খন্ড)	করুনা প্রকাশনী(১৯৭৭)
২. ভয় দেখানো ভয়ঙ্কর (১০ খন্ড)	মুখার্জী ব্রাদার্স (১৯৯৭)
৩. ভারতের উপকথা (১০ খন্ড)	মুখার্জী ব্রাদার্স (১৯৮০)
৪. মনীশ ঘটক: জীবন ও সাহিত্য	করুনা প্রকাশনী(১৯৮০)
৫. ভেরিয়ার এলুইন : নির্বাচিত রচনা	সাহিত্য অকাদেমি (২০০১)

পাঠ্যপুস্তক

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত,১৯৭১ থেকে ২০০০ খ্রী.

আনন্দপাঠ, পরিচায়িকা/পাঠমালা ১-৮,	সহ লেখিকা : গনেশ বাগচী
ছড়া ও ছন্দ (সংকলন)	সহযোগী : গনেশ বাগচী
কাব্য-বিচিত্রা ১ম/২য়	সম্পাদনা-সহযোগী: ভোলানাথ ঘোষ
গদ্য-বিচিত্রা ১ম/২য়	সম্পাদনা-সহযোগী: ভোলানাথ ঘোষ

ধাত্রীদেবতা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ)

নন্দন পাঠ	সহলেখক : মঞ্জুলা দত্ত

লক্ষ্মীবাঈ/ব্যাকরণবোধ/গঙ্গা থেকে সাগর/দ্র. কিশোর সাহিত্য/বাংলা গল্প সঞ্চয়ন প্রাথমিকা/ পাঠমালা ১-৮; অনুশীলন ১-৮

বাংলা গল্প সঞ্চয়ন	সম্পাদনা-সহযোগী : অজয় গুপ্ত

জাতকের গল্প নন্দিতা পাবলিশার্স ১৯৮১

অন্যান্যভাষায় অনুদিত উপন্যাস/গল্প/নাটক/প্রবন্ধ গ্রন্থ

ইংরেজি : পৃথক গ্রন্থ

1. Ek kori's dream National Book trust(1977)
   Tr. Lila Majumdar

2. Five plays Seagull Books(1986)
   Tr. Samik Bandyopadhyay
   1. Mother of 1084, 2. Aajir, 3. Bayen,
   4. Urvashi Mukherjee, 5. Water,

3. Etoa Munda Won the Battle National Book trust(1986)
   Tr. Meenakshi Mukharjee

4. Bashai Tudu Thema (1990)
   Tr. Samik Bandyopadhyay & Gayatri Chakravorty spivak,
   1. Operation Basai Tudu, 2. Draupadi,

5. Makar Sabar The statesman Festival(1991)
   Originally written in English by the author, then translated into Bengali by her.

6. Imaginary Maps thema also New York, Routledge(1991)
   Tr. Gayatri Chakravorty Spivak
   1. The Hunt, 2. Doulati the Bountiful,

3. Pterodactyl, puran sahay and pirtha,

7. Dust on the Road Seagull Books (1997)
Activist and political writings,
Ed. By maitreya Ghatak

8. Breast stories seagull Books (1997)
Tr. Gayatri Chakravorety Spivak
1. Drapadi, 2. Breast Giver, 3. Behind the Bodice

9. Rudali seagull Books (1997)
From fiction to performance story Rudali and
Play by Usha ganguli/ Tr. & intro. By Anjum
Katyal.

10. Bitter Soil seagull Books (1998)
Tr. Ipsita Chanda
1. Little one, 2. Seeds, 3. The witch, 4. salt,

11. Mother of 1084 seagull Books (1998)
Tr. Nirmal kanti Bhattacharjee

13. Our non-veg Cow and Other Stories, seagull Books (1998)
Tr. Paramita banerjee
1. Those Boys, 2. Nyadosh, the Incridible Cow,
3. Not a Cock and Bull story, 4. Phalgu's story,
5. Phalgu and the Cheetahh-Man, 6. The seven ghoshts,

7. Khuday the dacoit, 8. Shivaji's House, 9. All-alone,
10. Chittu,

14. Old women seagull Books (1999)
Tr. Gayatri Chakravorty Spivak,
1. Statue, 2. The fairy tale of Mohanpur

15. Titu mir seagull Books (2000)
Tr. Rimi B. Chatterjee

16. The Queen of Jhansi seagull Books (2000)
Tr. Mandira & Sagaree Sengupta

17. Till Death Do us part seagull Books (2001)
Tr. Vikram lyengar,
1. The divorce, 2. The poits wife, 3. The saga of Kagaboga, 4. He said pani, 5. Love story,

18. Chotti Munda and His Arrow seagull Books (2002)
Tr. Mandira and Sagaree Sengupta

19. Book of the Hunter seagull Books (2002)
Tr. Mandira & Sagarika Sengupta

20. OutCast seagull Books (2002)
Tr. Sarmistha Datta Gupta

১১১

1. Dhouli, 2. Shanichari, 3. the fairytale of Rajabasa,
4. Chinta,

21. The glory of Shri Shri Ganesh seagull Books (2003)
Tr. Ipsita Chanda

22. Romtha Seagull Books (2004)
Tr. Pinki Bhattacharjee

23. Dewana khoimala and the Seagull Books (2004)
Holy Banyan tree,
Tr. Pinaki Bhattacharjee,

24. In the name of the mother Seagull Books (2004)
Tr. Radha Chakravorty,
1. Ma, from Dusk of Dawn, 2. sindhubala,
3. Jamunabati's Mother, 4. Giribala,

25. Bait Seagull Books (2004)
Tr. Sumanta Banerjee
1. Fisherman, 2. Knife, 3. Body, 4. Killer

26. After kurukshetra Seagull Books (2005)
Tr. Anjum Katyal
1. The five women, 2. kunti and the Nishadin,
3. Souvali,

27. Wrong Numbar and Other stories Seagull Books (2005)
Tr. Subhransu Maitra
1. Wrong Numbar, 2. Fundamental Right
and BhiKhari Dusad, 3. Gandhi Maidan and
Raghuya Dusad, 4. Ram and Rahim,

28. Bedanabala, Her life time Seagull Books (2005)
Tr. Sunandini Benarjee,

29. The son, Tr. By the author, Sahitya Academi literary
Publist in Indian literature112, bio- monthly, Marc-April, 1986,

30. Death of jagmohan, the elephant, Tr. By the author and
published in, Setu. Vol-II No-3, 1986,

31. Salt,
1. Tr. By Sarmistha Dutta Gupta, publist in India literature: 157,
Sahitya Academi's Literary Bio-Manthly, sept-Oct. 1993,
2. Tr. by Tapan mitra, published in protest An anthology of Bengali
Short Stories of the 7o's. Ed. By: partha Chetterjee, Srijani, 1981.

ইংরেজি গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্প

1. Truth tales London, Women's press (1987)

New York, Feminist press91990)
Contemporary stories by Women Writers of India Rd. by: kali fpr Women the wet-Nurse

2. of Women, Outcastes UniversitI of
Peasant and Rebels, Ed. By California press (1990)
Kalpana Bardhan. A selection of Bengali
Short stories; 1. paddy seeds, 2. Dhouli,
3. the Funaral Wailer, 4. strange Children,
5. Witch Hunt, 6. Giribala,
Tr. By Kalpana Bardhan,

3. The inner Courtyard London, virago (1990)
Stories by Indian Women,
Ed. By: Lakshmi Holmstrom
1. Draupadi,

4. Noon in Calcutta Viking(1992)
Short stories from Bengal
Ed. By: Krishna Dutta & Edward Robinson
1. Water,

5. Separate Journeys New Delhi, Katha (1993)
Short stories by Contemprorary University of south
Indian Women, corolina press.
Ed. By :Geeta Dharmarajan
1. Bayen

Tr. By : Mohua Bhattacharjee

6. Women Writing In India, Vol-II, New York, Ed. By : Susie tharu & K. Lalita 1. Children, — The Feminist press at the university of New York (1993)

7. The Wordsmiths Ed. by Meenakshi Sharma 1. Arjun, — New Dilli, katha (1996)

8. The picador Book of Modern Indian Literature, Ed. By: Amit Chaudhury, 1. Arjun, — London picador(2001)

9. Her stories 20th Centuri Bengali Women writer Ed, by: Sanjukta Dasgupta, 1. Chinta, — New Dilli, Sristi(2002)

10. Crossing Ed, by: radha Chakravorty stories from Bangladesh and India, 1. Jamunaboti's Mothers, — Delhi, Indialog Publiscations(2003)

11. Inner Line Ed, by: Urvashi Butalia, 1. The Wet-Nurse, — dilhi, Zuban (2006)

12. Body Maps New Delhi, Kali/ Zuban (2007)
Stories of South Asian Women
Ed, by : Radha Chakravorty.
1. Sindhubala,

13. Three side of Life New Delhi, Oxford
Short stories ofBengali Women Writers, University press
Ed, by: Soumitra Chakravorty, (2007)
1. Dhouli, 2. The Divorce, 3. Love stori,

14. Speaking for my self An Anthology of Penguin
Asian Women's Writing, Ed, by: Enterprise (2009)
Sukrita paul Kumar and Malashri Lal,
1. Giribala,

সুইডিস

1. Branden ihjartat Ordfront och(2008)
Tr, by : Indiska biblioteket

জার্মান

1. pterodactylus Bonner siva series (2000)
Tr. by: Pankaj Chattopadhyay,

Ujjaini Halim, Martin Kunz, johannes
laping, Christing weip

2. Doulati Bonner Siva series (2002)
Tr. by: Barbara Dasgupta,
Ujjani Halim.
Martin Kunz, Hohannes Laping,

3. Mutter von 1084 Bonner siva series (2003)
Aparjita Koch, Ujjaini Halim, Martin Kunz,
johannes Laping,

4. Aufstand in Munda-Land Horlemann (2005)
Tr. by: Barbara Dasgupta, Durdana
Forster, Martin Kunz,Johannes Laping,
Christian Weib,

জাপানি

1. জগমোহনের মৃত্যু। হাজার চুরাশির মা, Tokyo(1992)
Tr. by: Masayaki O'nishi

2. দ্রোপদী ও অন্যান্য গল্প, Gendaikikakushitsa Publishers
দ্রৌপদী, স্তনদায়িনী, চোলি কা পিছে, ধীবর, Tokyo92003)
১০+১০, রাবণ, মোহন পুরের রূপ কথা

ফরাসী

1. La meredu 1084 Actes Sud (2001)
   হাজার চুরাশির মা, Tr. by: Marielle Morin

2. Indiennes/ Rudali et autes nouvelles Actes sud(2004)
   রুদালী, স্তনদায়িনী, দ্রৌপদী, মূর্তি
   Tr. by: Marille Morin

ইতালীয়

1. La Cuttura Theoria, Roma-napoli(1996)
অপারেশনবসাইটুডু,
   Tr. By: Federica Oddera & Babli Moitra Saraf

2. La preda Einaudi(2004)
   দ্রৌপদী, শিকার, বিছন, নুন, মূর্তি, ধৌলী, কুন্তি ও নিষাদী
   Tr. By: Babli moitra saraf & Federica Odderra

3. Invisibili Filema(2007)
মূর্তি, মোহনপুরেররূপকথা।
   Tr. By: Ambra pirri and Neeman sobhan

হিন্দি

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি(১৯৮৯)
অনুবাদিকা : চন্দ্র কিরণ রাধী

২. ভটকাও (ঘরেফেরা) — রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৮০)
অনু : জগত শঙ্খধর

৩. ভারত মেঁ বন্ধুয়া মজদুর — রাধাকষ্ণ প্রকাশন (১৯৮১)
অনু ; আনন্দ স্বরূপ বর্মা

৪. গ্রাম বংলা(২য় খন্ড) — রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৮২)
অনু ; ড. মাহেশ্বর

৫. নীল ছবি। অনু: ড. মাহেশ্বর — রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(১৯৯৩)

৬. শ্রেষ্ঠ কহানিয়াঁ। ৯টি গল্পের সংকলন, — ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট(১৯৯৩)
অনু : দ. মাহেশ্বর
বাঢ় (বান), বীজ, দ্রৌপদী, রাঙ্গ নাম্বর(রং নাম্বার),
শিকার, শাম সবেরে কী মাঁ (সাঁঝ সকালের মা)
বাঁয়েন, বেহুলা, মূল অধিকার ঔর ভিখারী দুসাদ,
(মৌলিক অধিকার ও ভিখারী দুসাদ)

৭. মাস্টার সাব। অনু : ড. রণজীত সাহা, — ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন(১৯৯৭)
পেপারব্যাক সংস্করণ(১৯৯৯)

৮. অক্লান্ত কৌরব। অনু: কৃষ্ণন কুমার রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(১৯৯৮)

৯. শ্রী শ্রী গনেশ মহিমা। অনু : রীনা দাস রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৯৮)

১০. টেরোডিকটিল, অনু: ড. মাহেশ্বর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৯৮)

১১. কৃষ্ণা দ্বাদশী। অনু : ড. মাহেশ্বর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (২০০০)

১২. বানিয়া বহু(বেনেবউ), ড. মাহেশ্বর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(২০০১)

১৩. জঙ্গল কে দাবেদার (অরন্যের অধিকার) রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (২০০১)

১৪. চোট্টিমুন্ডা ঔর তার তীর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(১৯৮১)

১৫. ১৯৮৪ বেং কী মাঁ (হাজার চুরাশির মা) রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৭৯)
অনু: সান্তনা নিগম

১৬. গহরাতী ঘটায়েঁ (নৈর্ঋতে মেঘ) রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন(১৯৮১)

১৭. এককড়ি কা সাধ। অনু: মোহিনী ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (১৯৭৬)

১৮. অগ্নিগর্ভ। অনু : জগত শঙ্খধর রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (১৯৭৯)

২০. ইটকে উপর ইট, অনু: প্রমোদ কুমার সিনহা রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন (৯১৯৮৪)

২১. মূর্তি, অনু : প্রমোদ কুমার সিনহা রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন

২২. পঞ্চাশ কহানিয়াঁ। অনু : সীতা ঘোষ রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন

২৩. ভুখ(ক্ষুধা) অনু : দিলীপ কুমার ব্যানার্জী, রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন

২৪. শাল-গিরহ্ কী পুকার পর, রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
(শাল গিরার ডাকে) অনু: মাহেশ্বর

২৫. ঝাঁসী কি রাণী, অনু : রাম শঙ্কর দ্বিবাদী রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন

২৬. জলিথী অগ্নিশিখা। অনু: রাম শঙ্কর দ্বিবেদী রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
(আগুন জ্বলেছিল)

২৭. চল রহী লড়াই। অনু : রামশঙ্কর দ্বিবেদী রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
(যে লড়াই থামলো না)

২৮. অমৃত সঞ্চয়। অনু : সুশিল গুহা রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন

২৯. পত্রকার, অনু : দিলীপ কুমার ব্যানার্জী রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
(সাংবাদিক)

৩০. ফলক তোড়নে হৈ। অনু: শ্যামা জৈন, রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
(ফলক ভাঙ্গার গল্প)

৩১. আধার মানিক। অনু: সুশীল গুপ্ত, রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
ঊনতিশ নম্বর আসামী। অনু: সোরিত

তামিল

1. Kattil Urimai (অরন্যের অধিকার) Sahitya Academi
   Tr. By: S. Krishnamoorthy

2. 1084 in amma (হাজার চুরাশির মা) Tamil Pustakalayam
   Tr. by: S. Krishinnamoorthy

3. Markar sabar Published in Megazine

4. seeds Published in Megazine

5. Bayin Published in Magazine

কন্নড়

1. Dropdi mattu Itara kategula Ankita prakaShana(1996)
   ৪টি গল্প: দ্রৌপদী, নুন, স্তনদায়িনী, মকর শবর,
   Tr. by: Srimathi

2. 1084ra Tayi (হাজার চুড়াশির মা) Ankita prakashana(1998)
   Tr. By: srimathi

3. Rudali (রুদালী) Ankita prakaShana(1998)
Tr. By: Srimathi

4. অরণ্যের অধিকার
A) Kadina Davedara Sahitya Academi(2000)
Tr. by: G. Kumarappa
B) Yaredee kaadu CVG Publications (2003)
Tr. by: Sujnana Murthy

5. Bete CVG Publications (2002)
দুটি গল্প: বেটি, দৌলতি
Tr. by: Srimathi

6. অগ্নিগর্ভ, Tr. by: G. Kurarappa Navakarnataka (2002)

৭. Ekkoriya (এককড়ির স্বপ্ন) IBH Prakashana(1976)
Tr. by: Iswara Chandra

মালয়ালাম

1. Amma(হাজার চুড়াশির মা) D. C. Books (1986)
Tr. by: Leela Sarkar

2. Tarashankar Bandyopadhyay Sahitya Academi(1976)
Tr. by: M. Achuthan

3. Aranyer Adhikar D. C. Books
Tr. by: Leela Sarkar

মরাঠি

1. Eka Kodice Svapana NBT(1979)
(এককড়ির স্বপ্ন) Tr. by: Amrendra Gadgil

তেলুগু

1. Tarashankar Bandyopadhyay Sahitya Academi(1978)
Tr. By: S. S Pravakar rao

2. Sri Sri Ganesh Mahima Hyderabad Book Trust
Tr. By: Geeta Rangaswami

3. The Mother 1084 Hyderabad Book Trust
Tr. By: Geeta Rangaswami

4. Aranyer Adhikar Hyderabad Book Trust
Tr. By: Geeta Rangaswami

গুজরাটি

1. Hajar Curasira Ma — Sadbhavan Prakashan(1985)
   Tr. By: Nispruha Desai

2. Sri Sri Ganesh Mahima — Uttam sahitya prakashan(1990)
   Tr. By: Nispruha desai

অসমীয়া

1. Aranyar Adhikar — Bhabani PubliShing
   Tr. By: Manu sen

2. Mahaswetadebir nirbachita Galpa — NBT
   Tr. By: Tilak Hazarika

ওড়িয়া

১. অরণ্যের অধিকার। অনু: অনন্ত মহাপাত্র হো — গ্রন্থ মন্দির

২. অরণ্যের অধিকার। অনু: পশুপতি জোনকো ঐ

মহাশ্বেতা দেবীর অগ্রন্থিত গল্প গুলি হল

১. রাস, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, 'সুন্দরম্' ভাদ্র-আশ্বিন, ১৯৫৭ খ্রী:,

২. পর্বত, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে জুন ১৯৫৮ খ্রী:,

৩. জোছনা রাতের ছেলে, মহাশ্বেতা দেবী, ঘরণী, ১৯৬২ খ্রী:,

৪. শান্তিসুধা সরণি, মহাশ্বেতা দেবী, শারদীয় ১৯৬৫ খ্রী:

৫. ঊনপঞ্চাশ নম্বর খুন, মহাশ্বেতা দেবী, অমৃত ৫ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, শুক্রবার ২২শে পৌষ, ১৯৬৫ খ্রী:

৬. প্রমান ছিল না, মহাশ্বেতা দেবী, কথাসাহিত্য, মাঘ ১৯৬৫ খ্রী:

৭. ঘড়ি, মহাশ্বেতা দেবী, অমৃত শারদীয়, ১৯৬৫ খ্রী:/ শ্যামল সেন চিত্রিত

৮. সমান্তরাল, মহাশ্বেতা দেবী, দীপান্তিতা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৯৬৬, নিতাই ঘোষ চিত্রিত

৯. খবর, মহাশ্বেতা দেবী, শারদীয় বসুমতি, ১৯৬৭ খ্রী:

১০. পায়রা, মহাশ্বেতা দেবী, শারদীয় গল্পভারতী, ১৯৬৮ খ্রী:

১১. হাতির পা, মহাশ্বেতা দেবী, অমৃত, ৮ম বর্ষ, ৩৩সংখ্যা, শুক্রবার ১২ পৌষ, ১৯৬৮খ্রী:

১২. অমলিনা, মহাশ্বেতা দেবী, শারদীয় ঘরণী, ১৯৬৮ খ্রী:

১৩. সোনার ময়ুর, প্রথম প্রকাশ শারদীয় প্রসাদ আশ্বিন-১৯৬৭ খ্রী:

১৪. এপার বাঙলা ওপার বাঙলা, প্র: প্র: সপ্তাহ শারদীয়-১৯৭৩ খ্রী:

১৫. দুই বিঘা জমি, সিনেমা জগৎ-১৯৭৩ খ্রী.

১৬. যোদ্ধা, প্র: প্র: অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন- জন্মভূমির গল্প, বাংলা ছোটগল্প সংকলন-১৯৮৩খ্রী.

১৭. সময় এই সময়- প্র: প্র: অগ্রনী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর/ডিসেম্বর ১৯৮৫খ্রী.

১৮. বানভাসি, প্র: প্র: শারদীয় সুকন্যা-১৯৮৫খ্রী.

১৯. নৈতিক, প্র: প্র: শারদীয় ইস্পাতের চিঠি, ১৯৮৮খ্রী.

২০. সস্তা ও দামি, প্র: প্র:আজকাল, রবিবাসর-১৯৮৯খ্রী.

২১. খরা, প্র: প্র: গল্প পত্র, শারদ সংখ্যা-১৯৮৯খ্রী.

২২. কান্না, প্র: প্র: প্রসাদ-১৯৭০খ্রী.

২৩. পরবাসী, শারদীয় উত্তর ভারতী-১৯৭১খ্রী.

২৪. চড়ক, শিলাদিত্য, পূজাসংখ্যা-১৯৮২খ্রী.

২৫. অবলা সবলা, প্র: প্র: কথাসাহিত্য, কার্তিক-১৯৭২খ্রী.

২৬. বিস্ময়, প্র: প্র: 'গন্ধবণিক'-১৯৭২খ্রী.

২৭. জল, প্র: প্র: 'অমৃত' শারদীয়-১৯৭৪খ্রী.

২৮. জানোয়ার, প্র: প্র: 'উল্টোরথ' ১৯৭৬খ্রী.

২৯. কমলালয়, প্র: প্র: শারদীয় 'চলার পথে' ১৯৭৬খ্রী.

৩০. অপারেশন বাকুলি, প্র: প্র: শারদীয় 'নবযুগ' ১৯৭৮খ্রী.

৩১. ঘর, প্র: প্র: 'সাহিত্য আকাশ' শারদীয়-১৯৭৮খ্রী.

৩২. ওরা, 'যুগান্তর' সাময়িকী-১৯৭৯খ্রী.

৩৩. শূন্যস্থান পূর্ণ করো, প্র: প্র: 'অনীক' অআস্ট-অক্টোবর-১৯৭৯খ্রী.

৩৪. পাপের উৎস সন্ধানে, প্র: প্র: 'এক্ষণ' শারদীয় ১৯৭৯খ্রী.

৩৫. টোটকা, প্র: প্র: 'সত্যযুগ' শারদীয় ১৯৮০খ্রী.

৩৬. পিতাপুত্র, প্র: প্র: 'নহবৎ' শারদীয় ১৯৮০খ্রী.

৩৭. জোচ্চোর, প্র: প্র: অনীক, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৮২খ্রী.

৩৮. ভয়, প্র: প্র: প্রতিলিপি, আশ্বিন-১৯৮২খ্রী.

৩৯. কানু, প্র: প্র: 'আমুখ' লিটল ম্যাগাজিন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে-আগষ্ট, ১৯৮৩খ্রী.

৪০. একটি বিকেলের গল্প, গল্পভারতী-১৯৬০খ্রী.

৪১. রাজযোটক, সচিত্র শ্রীমতী, পৌষ-১৯৫২খ্রী.

৪২. নকল, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২ খ্রী.

৪৩. মমতামাসি, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২খ্রী.

৪৪. দোষ, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২খ্রী.

৪৫. জ্যামিতিক, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড,

দে'জ, ২০০২,খ্রী.

৪৬. প্রতিবিম্ব,প্র : প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২ খ্রী.

৪৭. স্বাতী চৌধুরী, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২খ্রী.

৪৮. পণ্য, প্র: প্র: স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন, মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২খ্রী.

৪৯. ভৌগলিক, একতা (বহরমপুর), পূজা-১৯৬৭খ্রী.

৫০. সই, উল্টোরথ, পৌষ-১৯৬৮খ্রী.

৫১. দাম্পত্য, প্র: প্র: অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন - মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৭ম খন্ড, দে'জ, ২০০২ খ্রী.

তথ্য সুত্র

১. সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ-১৮৮।
২. সাত দশক সমকাল ও আনন্দ বাজার, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৯, আনন্দ বাজার, কালকাতা।
৩. তদেব, পৃ-৭৪
৪. তদেব, পৃ-৭৭
৫. তদেব, পৃ-৯৩
৬. সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহীত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ-১৮৩
৭. সুমিতা চক্রোবর্তী, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ-৬৯
৮. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা পৃ-৫৮০
৯. তদেব, পৃ-৫৮২
১০. সুমিতা চক্রোবর্তী, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ-৩০
১১. মায়াবী নিষাদ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬/১৯৬৯
১২. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৭৭৫
১৩. তদেব, পৃ- ৮৭২,
১৪. কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরূণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-৪১২
১৫. তদেব, পৃ-৪১৩
১৬. তদেব, পৃ-৪১২
১৭. তদেব, পৃ-৪১৪
১৮. তদেব, পৃ-৪১৮

১৯. তদেব, পৃ-৪২০

২০. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য, মেদিনী পুর, পৃ-৮৬

২১. তদেব, পৃ-৮৭

২২. 'A Glossary of contemporary literary theory', 4th Editing, teremy How thorn, Arnold, 200, p-37.

২৩. শৈলেন্দ্র নাথ কাবাসী (সম্পাদিত), শিল্পভাষা, কলকাতা, জানুয়ারী-জুন, পৃ-৪৬-৪৭

২৪. ভগিরথ মিশ্রের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারী-১৯৯৬, পৃ-৭

২৫. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য, কলকাতা, পৃ-৯১

২৬. 'নীল লোহিত', সম্পাদক- বাসব দাসগুপ্ত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিদেম্বর-২০০৮, ৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন,২০০৯, পৃ-৫১

২৭. শ্রেষ্ঠগল্প ভগিরথ মিশ্রের, দে'জ, কলকাতা, নভেম্বর-২০০২, পৃ-১৫০,

২৮. ঝরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'আমার উপন্যাসের জন্ম বৃত্তান্ত' তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক, প্রাক্ সারদ সংখ্যা-১৯১৫, পৃ-১০৯

২৯. শ্রেষ্ঠগল্প, ঝরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, পৃ-৯

৩০. শ্রেষ্ঠগল্প, অমর মিত্র, করুনা প্রকাশনী-২০০৩, পৃ-৮,

৩১. তদেব

৩২. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য, পৃ-১১১

৩৩. অনিল ঘড়াই, 'সখের বাগানে শীতের রাত', সুস্নাত জানা ও সুনিল মাঝি সম্পাদিত, প্রসঙ্গ অলিল ঘড়াই, দে'জ, কলকাতা, জুন-২০০৪, পৃ-৪৬৯-৭০

৩৪. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য, মেদিনী পুর,মেদিনী পুর, পৃ-১৩১

৩৫. শ্রেষ্ঠগল্প, অনিল ঘড়াই, পৃ-২০

৩৬. সত্তর পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের সময় ও সমাজের বিবর্তন, মনোতোষ দাস, গবেষণা গ্রন্থ, অপ্রকাশিত, পৃ-৭৯

৩৭. কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-৪৬৮

৩৮. তদেব, পৃ-৪৬৯

৩৯. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৫৯১

৪০. কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরূণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪২২

৪১. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৫৬০

৪২. কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরূণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৮০

৪৩. তদেব, পৃ- ৪৮১

৪৪. তদেব, পৃ-৪৮১

৪৫. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৫৬১

৪৬. তদেব, পৃ-৫৪০,

৪৭. কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরূণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৯০,

৪৮. তদেব, পৃ-৪৮৫

৪৯. তদেব, পৃ-৪৭১

৫০. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৯ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-৫০২

৫১. মহাশ্বেতার গল্প মহাশ্বেতার সন্ধানে, উৎপল মন্ডল, কামনা মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রথ যাত্রা-২০১২, পৃ-১১৯

৫২. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-৬১

৫৩. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র ১০ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ-৪১৮

৫৪. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র ৯ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫১৯

৫৫. তদেব, পৃ-৫১৯

৫৬. তদেব, ৩য় খন্ড পৃ-৪৬৮

৫৭. তদেব ৮ম খন্ড, পৃ-৪১০

৫৮. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-৭০-৭১
৫৯. অরুপ কুমার দাস, সমাজ দন্দ্ব ও বাংলা কথা সাহিত্য, কোলকাতা, পৃ-১৫০
৬০. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-৯
৬১. ধীমান দাস গুপ্ত, ওঁস্বঃস্বহা, এবং মুশায়েরা, কোলকাতা, শারদীয়-১৪০৭, পৃ-১১
৬২. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র ৯ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫১৫
৬৩. তদেব, পৃ-৫১৯
৬৪. তদেব, পৃ-৫২১
৬৫. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-১০
৬৬. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-১০
৬৭. অমৃতলোক, সংখ্যা-১০৩, অক্টোবর-মার্চ, কলকাতা, পৃ-৩৪
৬৮. প্রশংসা বা প্রচারে বিশ্বাসী নই, মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, অমর মিত্র, পৃ-৯১, শিল্প সাহিত্য, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯
৬৯. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫৩০
৭০. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫৩০
৭১. ছায়া দর্পনে মহাশ্বেতা, কনিকা বিশ্বাস, এবং মুশায়েরা, কলকাতা অক্টোবর, ২০১১, পৃ-১ ১৩
৭২. তদেব, পৃ-১১৪
৭৩. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫৩৩
৭৪. রোমথা, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেট, কলকাতা, পৃ-৭৯
৭৫. মহাশ্বেতা দেবী শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অজয় গুপ্ত, পৃ-১০
৭৬. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, পৃ-৮
৭৭. মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, ভূমিকাংশ, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ-৮
৭৮. সতী, মহাশ্বেতা দেবী, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ-১৪৩